দাম : পঞ্চাশ টাকা

স্বস্তিকা

৭৪ বর্ষ, ২০ সংখ্যা।। ২৪ জানুয়ারি, ২০২২
১০ মাঘ- ১৪২৮।। যুগাব্দ - ৫১২৩
সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা
website : www.eswastika.com

৭৫ স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

EDEN.
Honest Promises. Honest Performances.

EDEN RICHMOND PARK

10 BLOCKS

AT ATLAS MORE, NEAR NARENDRAPUR R.K. MISSION, GARIA

300 VICTORIAN RESIDENCES

Hyde Park - Landscaped Gardens | ***Windsor Hall*** - AC Community Hall
Theatre Royale - Home Theatre Room | Swimming Pool | Gymnasium & Spa
Children's Play Pen | Billiards Room | Games Room | Cards Room | **24 hrs** Security

LIMITED PERIOD OFFER

2BHK
(844 - 994 sq ft)
Rs.65,000/- *off*
FROM 21.35 LACS ONWARDS

3BHK
(1035 - 1318 sq ft)
Rs.85,000/- *off*
FROM 26 LACS ONWARDS

Location map

www.edengroup.in
84500 84500 | 98300 63776

With Best Compliments
from -

SRESTH PRODUCTS PVT. LTD.

Dealing in all kind of edible oil

49, Strand Raod
Kolkata - 700 007

With Best Compliments
from -

ANIK BANERJEE

With Best Compliments
from -

TILAK RANJAN BERA

With Best Compliments
from -

JAYANTA PAUL

।। ॐ ।।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

प्रधान कार्यालय : डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपुर – 440 032
दूरभाष : (0712) 2723003, 2720150 Email-sachivalay@hedgewarbhavanngp.in

मार्गशीर्ष कृ. 13, युगाब्द 5123

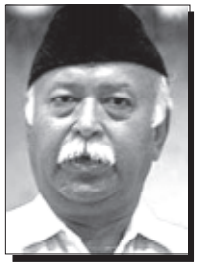

01.01.2022
नागपुर

राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित राष्ट्र भावजागरण का व्रत लेकर सातत्यपूर्ण साहित्य शारदा की सेवा में रत "स्वस्तिका" साप्ताहिक भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव संपन्न करते समय यह विशेषांक प्रकाशित कर रहा है यह अभीनंदनिय आनंददायि समाचार है।

स्वतंत्रता 'स्व' का बोध कराने वाले आत्म गौरव की भावना से ओतप्रोत जनमानस की एकात्म शक्ति की नैसर्गिक स्वाभाविक प्रस्तुति है। सब प्रकार के अवरोध व बाधाओं को परास्त कर अपने पुरखों के अतुलनीय त्याग बलिदानों से यह स्वाधीनता हमें प्राप्त हुई है। देशभक्त, चारित्र्यसंपन्न, सशक्त, संगठित समाज ही स्वतंत्रता का चिरस्थायी आनंद को पा सकता है। इसे अक्षुण्ण रखना तथा करुणामयी कल्याणमयी भारत माता का वैभवसंपन्न स्वरूप अखिल जगत में स्थापित करना यह हमारा सर्वोच्च प्राथमिक कर्तव्य बनता है।

सब प्रकार के अवरोध बाधाओं का निर्भयता से सामना कर "स्वस्तिका" साप्ताहिक अपनी यथार्थ भूमिका की साहित्य समिधा इस राष्ट्र यज्ञ में गत अनेक वर्षों से समर्पित कर रहा है। अमृत महोत्सव विशेषांक की सफलता हेतु प्रयासरत संपादक गण का हार्दिक अभिनंदन एवं शतकोटी शुभकामनाएं।

मोहन भागवत

फ: १

।। ॐ ।।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

प्रधान कार्यालय : डॉ. हेडगेवार भवन, महाल, नागपुर – 440 032
दूरभाष : (0712) 2723003, 2720150 Email-sachivalay@hedgewarbhavanngp.in

मार्गशीर्ष कृ. 13, युगाब्द 5123 | 01.01.2022 नागपुर

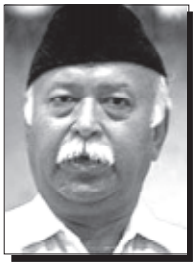

শুভেচ্ছা বার্তা

রাষ্ট্রীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাষ্ট্রভাব জাগরণের ব্রত নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্য-সরস্বতীর সাধনায় রত সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের সময় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে-- এটা অভিনন্দনযোগ্য ও আনন্দদায়ক বিষয়।

স্বাধীনতা হলো 'স্ব'-এর বোধ উদ্রেককারী আত্মগৌরবের ভাবনায় ওতপ্রোত জনমানসের একাত্ম শক্তির একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সমস্ত রকমের বাধাবিপত্তিকে পরাস্ত করে আমাদের পূর্বপুরুষদের অতুলনীয় ত্যাগ ও বলিদানের ফলে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। দেশভক্ত, চরিত্রসম্পন্ন, শক্তিশালী ও সংগঠিত সমাজই স্বাধীনতার চিরস্থায়ী আনন্দ উপভোগ করতে পারে। একে অক্ষুণ্ণ রাখা এবং করুণাময়ী ও কল্যাণময়ী ভারতমাতার বৈভবসম্পন্ন স্বরূপ সমগ্র বিশ্বে স্থাপিত করা আমাদের সর্বোচ্চ ও প্রাথমিক কর্তব্যের মধ্যে এসে যায়।

স্বস্তিকা পত্রিকা নির্ভয়ে সবরকম বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হয়ে বহু বছর ধরে রাষ্ট্রযজ্ঞে তার সাহিত্য-সমিধা সমর্পণ করে চলেছে। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে প্রয়াসরত সম্পাদক-সহ সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শতকোটি শুভেচ্ছা জানাই।

মোহন ভাগবত

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

সাধারণতন্ত্র বিশেষ সংখ্যা

৭৪ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ১০ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৪ জানুয়ারি - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ৫০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ১১

'স্ব'-এর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম □ দত্তাত্রেয় হোসবালে □ ১৩

অধ্যাত্মবোধে ঋদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম □ ড: স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ □ ১৬

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অবদান □ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী □ ১৮

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার অবদান □ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ২৪

পতিতার কপর্দকহীন জীবনে দেশপ্রেমের ঋজুতা □ ড. রাজলক্ষ্মী বসু □ ২৮

দাঙ্গা-কবলিত ভারতবাসীকে বাঁচিয়েছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই □ সুজিত রায় □ ৩২

স্বয়ংসেবকরা সচেতন না থাকলে সেদিন পাকিস্তান ভারত দখল করত □ সু. রা □ ৩৬

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ □ সুব্রত ভৌমিক □ ৪১

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ চেতনা □ ঋতাসনা সরকার □ ৪৮

কদম কদম বাড়ায়ে যা— □ মনোজিৎ সরকার □ ৫০

স্বাধীনতাযুগের 'কলম' বনাম আজকের ফেক আর পেড নিউজ □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৫২

ইতিহাসে উপেক্ষিতা অগ্নিকন্যা
□ সিদ্ধার্থ পাল □ ৫৬

দু'হাতে রিভলবার চালিয়ে পুলিশের জাল কেটেছিলেন অনন্ত সিংহ
□ রুদ্র মিত্র □ ৫৭

স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদা জেলার অবদান □ তরুণ কুমার পণ্ডিত □ ৫৯

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি গড়ে দিয়েছিল হিন্দু মেলা
□ অভিমন্যু গুহ □ ৬৪

স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের অবদান □ সাধন কুমার পাল □ ৬৬

সূর্য সেনের মৃতদেহকেও নিরাপদ মনে করেনি ইংরেজরা
□ বাসুদেব ধর □ ৬৮

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ভারতীয় অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব
□ বিমল শঙ্কর নন্দ □ ৭১

ইংরেজিয়ানার আবর্জনা সরিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সফল ভারত
□ ড. তরুণ মজুমদার □ ৭৪

স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরভূমের অবদান □ সোমেশ্বর বড়াল □ ৭৬

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

স্ব-তন্ত্রের পথে অগ্রসর ভারত

ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞানে- গরিমায়, সাহিত্যে-শিল্পে বিশ্বের মধ্যে অগ্রণী ছিল। প্রাচীন ভারতের যাহা কিছু সাধনা তাহা বিশ্বের কল্যাণে। সনাতন চিন্তায় ভারতের কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণের নিমিত্তই ছিল। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন জনপদের শাসনভার দেশীয় রাজা-মহারাজাদের হস্তে অর্পিত ছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের কল্যাণই মুখ্য ছিল যাহা আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা। সেই অবস্থায় সামগ্রিক ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশীয় শিল্প বিদেশে কদর লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য দেশের বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতবর্ষে আসিত। কিন্তু বারোশত বৎসর পাঠান,মোগল, ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশি শাসনকালে ভারতবাসী কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সমগ্র বিশ্বের অর্ধাংশ এক সময় ইংরাজের পদানত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওই সমস্ত দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে জাপান। আমেরিকার পাঠানো যৌতুকস্বরূপ জাহাজ ভর্তি কমলালেবু দেশের মাটি স্পর্শ করিতে না দিয়া তাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বাভিমান বজায় রাখিয়াছে। জাপানের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও অধ্যাপকরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষণ বয়কট করিয়া বলিয়াছিলেন পরাধীন দেশের মানুষের মুখে জ্ঞানের কথা শুনিবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। পরাধীন ভারতের মনীষী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র, জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানী সমগ্র বিশ্বে দেশের সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ নিজের নিজের বিচার বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের স্বকীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন। শত শত বীর বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বলিদান দিয়াছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধ চলিয়াছে। দেশের যুবসমাজ এমনকী মাতৃশক্তিও স্বাধীনতা যুদ্ধে শামিল হইয়াছেন। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হইবার পর স্বাধীনতা আন্দোলন রাজনীতির আবহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে পারিলেও ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগের গ্লানিও মানিয়া লইতে হইয়াছে। গত ৭৫ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার মিষ্ট স্বাদ যত না পাওয়া গিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি দেশভাগের বিষময় ফল বর্তমান ভারতকে বার বার কলুষিত করিয়াছে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারকে মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সংবিধানে বিভিন্ন মৌলিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ থাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা রূপায়ণে বার বার বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে সেনাবাহিনীর কাজকর্মকেও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থে দেশেরই কিছু মানুষ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করাইয়াছে।

ইহার কারণ হইল ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলেও স্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহার প্রমাণ, স্বাধীন ভারতেও ১০ মাস ভারতের গভর্নর জেনারেল এবং ১৭ মাস সৈনাধ্যক্ষ পদে ইংরেজই বহাল ছিলেন। প্রশাসনের সর্বত্র ইংরেজ প্রর্তিতত ব্যবস্থাই চলিতেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্যই ছিল স্বরাজ। আসলে সেইদিন ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছিল মাত্র,আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারি নাই। যাঁহারা জীবন বাজি রাখিয়াা দেশের জন্য লড়াই করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শাসন ক্ষমতা হইতে দূরে রাখা হইয়াছিল। দেশের পুনর্নির্মাণে তাঁহাদের চিন্তাধারাকে মান্যতা দেওয়া হয় নাই। ইংরেজরা যেমনভাবে দেশকে তৈরি করিতে চাহিয়াছিল, স্বাধীনতার পর সেইরকম লোকেরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর সৌভাগ্য, বিলম্বে হইলেও পুনরায় দেশে স্ব-তন্ত্র, স্ব-রাজ ও স্বাধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু হইয়াছে। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই ভাব নির্মাণই স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপনের সার্থকতা।

সুভাষিতম্

কলহান্তানি হর্ম্যাণি কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্।

কুরাজান্তানি রাষ্ট্রাণি কুকর্মান্তং যশো নৃণাম্।।

কলহের কারণে বড়ো বড়ো প্রাসাদ নষ্ট হয়ে যায়, কুবচনের ফলে মিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়, অযোগ্য শাসকের কারণে রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে যায় এবং কুকর্মের কারণে খ্যাতি নষ্ট হয়ে যায়।

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না
স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম
চির পরিচিত
দুলালের ®
তালমিছরি
আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
--- দারুণ কাজ দেবে।
ভারত সরকারের
R
® চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন
দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী
Regd. Trade Mark
দুলালের
তালমিছরি
INDIA TRADE MARK
R
দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

‘স্ব’-এর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম

দত্তাত্রেয় হোসবালে

এখন ভারত ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির উৎসব পালন করছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেমন স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরের যাত্রার মূল্যায়ন হবে, তেমনই এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য চার শতাব্দীর অধিক কালখণ্ডে সতত সংঘর্ষ ও বলিদানের পুণ্যস্মরণও স্বাভাবিকভাবেই হবে।

‘স্ব’-এর ভাবে অনুপ্রাণিত

ভারতে ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে চলা রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ‘স্ব’-এর ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল যা স্বধর্ম, স্বরাজ ও স্বদেশির ত্রয়ীরূপে সারা দেশকে উথালপাথাল করেছিল। সাধুসন্ত ও মনীষীদের সান্নিধ্যের কারণে আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা অন্তঃসলিলারূপে নিরন্তর প্রবাহিত ছিল। যুগ যুগ ধরে ভারতের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত ‘স্ব’-এর ভাব তার পূর্ণশক্তিতে প্রকটিত হয়েছিল, যার ফলে বিদেশি শক্তিগুলিকে পদে পদে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদেশি শক্তিগুলি ভারতের আর্থিক, সামাজিক ও শৈক্ষিক ব্যবস্থাকে তছনছ করেছিল, স্বাবলম্বী গ্রামগুলি নষ্ট করে ফেলেছিল। তা সত্ত্বেও বিদেশি শক্তির বহুমুখী আক্রমণকে সেইসময় ভারত-সন্তানরা সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করেছিল।

অতুলনীয় ছিল ভারতীয় প্রতিরোধ

ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধ বিশ্ব ইতিহাসে এক অতুলনীয় উদাহরণ। এই বহুমুখী লড়াইয়ে একদিকে যেমন প্রতিরোধ ছিল, তেমনই অন্যদিকে ভারতীয় সমাজকে শক্তিশালী করার জন্য কুপ্রথাগুলি দূর করে সামাজিক পুনর্রচনার কাজও জারি ছিল। দেশীয় রাজন্যবর্গ যেমন তাঁদের শক্তিতে ইংরেজদের মোকাবিলা করছিলেন, তেমনভাবেই নিজেদের সহজ-সরল জীবনযাত্রায় ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ও জীবনমূল্যের ওপর হামলার প্রতিবাদে স্থানে স্থানে জনজাতি সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের স্বাভিমান রক্ষায় জাগ্রত এই লোকেদের ইংরেজরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, কিন্তু তারা সংঘর্ষ থেকে পিছু হঠেনি। ১৮৫৭ সালে সংঘটিত দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামই এর প্রমাণ, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ বলিদান করেছেন।

শিক্ষা, কলা ও সংবাদপত্র দ্বারা জাগরণ

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে নষ্ট করার প্রয়াসকে বিফল করার জন্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী, গুজরাট বিদাপীঠ, এমডিটি হিন্দু কলেজ তিরুনেলবেলী, কর্বে শিক্ষণ সংস্থা, ডেকান এডুকেশন সোসাইটি এবং গুরুকুল কাংড়ীর মতো প্রতিষ্ঠান সক্রিয় হয়ে পড়ে এবং বিদ্যার্থীদের মধ্যে দেশভক্তির জাগরণ ঘটাতে থাকে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের প্রতিভা ভারতের উত্থানের জন্য সমর্পিত করেন। নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দাদাসাহেব ফালকের মতো কলাকুশলীরা এবং মাখনলাল চতুর্বেদী-সহ সমস্ত জাতীয়বাদী নেতা সাংবাদিকতার দ্বারা জনজাগরণে লেগে পড়েছিলেন। তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে দেশজাগরণে সক্রিয় ছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ প্রমুখ মনীষীর আধ্যাত্মিক প্রেরণা এঁদের পথপ্রদর্শক হিসেবে সহায়ক ছিল।

বঙ্গপ্রদেশে রাজনারায়ণ বসুর দ্বারা হিন্দু মেলার আয়োজন, মহারাষ্ট্রে লোকমান্য তিলকের দ্বারা গণেশ উৎসব ও শিবাজী উৎসবের মতো সাংস্কৃতিক কাজকর্ম যেমন ভারত সংস্কৃতির মূলকে সঞ্জীবীত করছিল, তেমনই জ্যোতিবা ফুলে ও সাবিত্রীবাঈ ফুলের মতো সমাজ সংস্কারক নারী শিক্ষা ও সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে শক্তিশালী করার গঠনমূলক কাজে লেগেছিলেন। সমাজকে সংগঠিত ও সামাজিক সমতার জন্য সংঘর্ষের পথ দেখাচ্ছিলেন ড. আম্বেদকর। ভারতীয় সমাজজীবনের কোনও ক্ষেত্র গান্ধীজীর প্রভাব থেকে বঞ্চিত ছিল না। তেমনই বিদেশে থেকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কাজ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, লালা হরদয়াল, মাদাম কামার মতো লোকেরা করছিলেন। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত গতিবিধির কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। স্বাতন্ত্র্যবীর সাভারকরের লিখিত ১৮৫৭-র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। ভগৎ সিংহ নিজে এই পুস্তক প্রকাশ করে বিপ্লবীদের মধ্যে বিতরণ করেন।

বিপ্লবী গতিবিধি

সারাদেশে সক্রিয় চারশোর বেশি গুপ্ত সংগঠনের বিপ্লবীরা জীবন বাজি রেখে ভারতমাতাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার অভিযানে সক্রিয় ছিলেন। বঙ্গপ্রদেশের বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতিতে সক্রিয় ডাঃ হেডগেওয়ার লোকমান্য তিলকের প্রেরণায় কংগ্রেসে যুক্ত হন এবং সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সচিব নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে নাগপুরে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের আয়োজন সমিতির তিনি উপ-প্রধান ছিলেন। এই অধিবেশনে তিনি তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে মিলিতভাবে পূর্ণস্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণের জন্য সাধ্যমতো প্রয়াস করেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। আটবছর পরে এই প্রস্তাব লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হয়।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সৈনিক বিদ্রোহ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত সরকারই শুধু গঠিত হয়নি, পূর্বোত্তর ভারতের কিছু অংশকে স্বাধীন করার সাফল্যও লাভ করেছিল। লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচারের প্রহসনে সারা দেশ ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। এর সঙ্গেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে নৌবিদ্রোহ ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিল।

দেশ বিভাজন স্বীকার

স্বাধীনতার সূর্যোদয় হয়েছে কিন্তু দেশভাগের অভিশাপও তার ওপর চেপে বসেছিল। এই কঠিন পরিস্থিতিতেও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর শ্রেয় সেইসব ভারতীয়দের প্রাপ্য, যাঁরা বহু বছর ধরে রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য নিজের রক্ত ও ঘাম ঝরিয়েছেন। ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, 'ভারতকে উঠে দাঁড়াতে হবে, শুধু নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য, সমগ্র মানবতার জন্য। তাঁর এই ঘোষণা সার্থক হয়েছে। কারণ ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছেন। একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হয়েছে আর ব্রিটিশ সূর্য চিরতরে অস্তমিত হয়ে গিয়েছে।

ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রথমদিন থেকেই

পর্তুগিজ, ডাচ, ফ্রেঞ্চ এবং সবশেষে ব্রিটিশরা ভারতে আসে। সবাই ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করা এবং ধর্মান্তরণ করার চেষ্টা নিরন্তর করেছে। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা যেদিন ভারতের মাটিতে পা রেখেছিল, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সেদিন থেকেই প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ মার্তণ্ড বর্মার হাতে পরাজিত হয়ে ডাচেদের ভারত ছাড়তে হয়েছে আর পর্তুগিজরা গোয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গিয়েছে। আধিপত্যের সংঘর্ষে ব্রিটিশরা বিজেতা রূপে উঠে এসেছিল। তারা কুটিলতার দ্বারা অর্ধেকের বেশি অংশে শাসন কায়েম করেছিল। বাকি অংশে ভারতীয় দেশীয় রাজাদের শাসন বহাল ছিল। পরে ইংরেজরা এদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। স্বাধীনতার পর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। স্বাধীন ভারত গণতন্ত্রের পথকেই বেছে নিয়েছে। আজ তা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ও সফল গণতন্ত্র। যাঁরা ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যকে রক্ষা করার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরাই স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করেছেন। সেজন্যই সংবিধানের প্রথম সংখ্যায় বিভিন্ন চিত্রের মাধ্যমে রামরাজ্যের কল্পনা করা হয়েছে। তাঁরা ব্যাস, বুদ্ধ ও মহাবীরের মতো ভারতীয়ত্বের প্রচারকদের চিত্র প্রদর্শিত করে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার কাজ করে গেছেন।

স্বাধীনতার পেছনে কয়েক প্রজন্মের সাধনা

'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব' সেইসব বীরগতিপ্রাপ্ত ও দেশভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্থাপনের মুহূর্ত। তাঁদের ত্যাগ ও বলিদানের কারণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে যথোচিত স্থান প্রাপ্ত করার দিশায় এগিয়ে চলেছি। সেই সমস্ত বীর, অজ্ঞাত ঘটনা, স্থান, সংস্থা, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে দিশা দিয়েছে, তারা মাইলফলক রূপে রয়ে গিয়েছে। তাদের পুনরাবলোকন, মূল্যায়ন এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত লোককথা ও স্মৃতিগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে আজ যে স্বাধীনতা আমরা ভোগ করছি তার পিছনে রয়েছে প্রজন্মব্যাপী সাধনা, শতাব্দী ক্ষরিত রক্ত, ঘাম ও অশ্রু। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে এদের স্মরণ করাই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

যুগান্তর দলের প্রথম সারির বিপ্লবী

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশ ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বেহালায় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ তৈরি হয়। হরিনাভি স্কুলে পড়ার সময় ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানাবার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায়-সহ একঝাঁক ছাত্রদের স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। সেই বিতাড়িত দলের অন্যতম ছিলেন তিনি। এরপর যুগান্তর দলের প্রবীণ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন সাতকড়ি।

১৯১৪-তে গদর পার্টির বিপ্লবীরা 'কোমাগাতামারু' জাহাজে বজবজে এলে তাদের গোপনে সাহায্য করেন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় গেরিলা যুদ্ধের প্রয়োজনে ম্যাপ ও নকশাও সংগ্রহ করেছিলেন। ১৯১৫ সালে বিপ্লবী বাঘাযতীন তাঁকে পাঠান হ্যালিডে দ্বীপে জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য। জাহাজ থেকে গোপনে অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। নানা কারণে যদিও সেই জাহাজ অবতরণ করতে পারেনি। এই বছরই বাঘা যতীনের দূত রূপে নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যুগান্তর দলের বিদেশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর।

১৯৩০ সালে অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার চক্রান্তে জড়িত ছিলেন সাতকড়ি। যুগান্তরের বারুইপুর শাখা সংগঠনের নেতা থাকাকালীন সাতকড়ি ছিলেন কানাইলাল ভট্টাচার্যর গুরু স্থানীয়। ১৯১৩-এর ২৭ জুলাই সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শেই বিচারক গার্লিককে 'বিমল গুপ্ত' ছদ্মনাম নিয়ে হত্যা করেন কানাইলাল।

৪ মার্চ ১৯১৬ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। পরে উত্তরপ্রদেশের নৈনি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বন্দিদের ওপর অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন অনশন করেন তিনি। ১৯২০ সালের ১৩ জানুয়ারি মুক্তি পেয়ে আবার সংগঠনের কাজে নেমে পড়েন। পুলিশ তাকে ১৯২৪ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার করে, তিনবছরের জন্য কারাবাসে পাঠায়। মুক্তিলাভের পর বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের জন্যে ১৯৩০ সালে তাকে নজরবন্দি করে ব্রিটিশ সরকার। সারাজীবন বিপ্লবের বন্ধুর পথ ত্যাগ করেননি সাতকড়ি। শেষজীবনেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তিনি নানাভাবে কাজ করে গেছেন। ফলস্বরূপ ১৯৩২ সালে দেউলি জেলে আটক হন। ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৭ সালে জেলেই অসুস্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। □

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

অধ্যাত্মবোধে ঋদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

ড: স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ

ঋষি অরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া অভিভাষণে ১৯০৯ সালের ৩০ মে বলেছিলেন, ‘‘আমাকে যে কথা দেওয়া হয় কেবল সেইটিই আমি আপনাদের বলতে পারি। সে-কথা এখন সমাপ্ত হয়েছে। ইতিপূর্বে একবার আমার মধ্যে এই শক্তি নিয়ে কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম যে, এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, আর জাতীয়তা রাজনীতি নয়, পরন্তু একটা ধর্ম, একটা বিশ্বাস, একটা নিষ্ঠা। আজ আবার আমি সেই কথাই বলছি। কেবল অন্যভাবে। আর আমি বলি না যে, জাতীয়তা একটা বিশ্বাস, একটা ধর্ম, একটা নিষ্ঠা; আমি বলছি, আমাদের পক্ষে সনাতন ধর্মই হচ্ছে জাতীয়তা। এই হিন্দুজাতি জন্মেছিল সনাতন ধর্ম নিয়ে, এর সঙ্গেই সে চলে, এর সঙ্গেই সে বিকাশ লাভ করে; যখন সনাতন ধর্মের অবনতি হয় তখনই জাতির অবনতি হয়, আর যদি সনাতন ধর্মের ধ্বংস হওয়া সম্ভব হত তাহলে সনাতন ধর্মের সঙ্গে এই জাতিটাও ধ্বংস হত। সনাতন ধর্ম – এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা। আপনাদের নিকট এই আমার বাণী।’’ এই অভিভাষণের অন্তর্নিহিত অর্থে এভাব স্বপ্রকাশিত যে জাতি গঠনে ও জাতীয়তাবোধ উন্মেষণে সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বন্দে মাতরম্ রাষ্ট্রগীতেও সনাতন ধর্মের প্রভাব সর্বজনগ্রাহ্য। তাঁর রচিত বন্দে মাতরমে রয়েছে ‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা কমল-দলবিহারিণী, বাণী বিদ্যায়িনী নমামি ত্বাং । নমামি কমলাম্, অমলাং অতুলাম্ সুজলাং সুফলাং মাতরম্, বন্দে মাতরম্। শ্যামলাং, সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্ ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।’ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশমন্ত্রে বলেছেন, ‘‘হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধর্ম, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই ‘মায়ের’ জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বলো ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। আর বলো দিনরাত, ‘হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।’’

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দের উদ্ধৃতিগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে যে বার্তা আমাদের কাছে সহজভাবে আসছে তাহলো অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত না হলে ভারতবর্ষের মূল ভাবটির সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না। অধ্যাত্মবাদ শব্দটির থেকে অধ্যাত্মবোধ শব্দটি ভারতবর্ষের মূল ভাবের সঙ্গে অনেক নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। আমরা ধনতন্ত্রবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে মিলিয়ে অনেক সময় অধ্যাত্মবাদ বলে থাকি, তবে ‘বাদ’ শব্দটির ভারতীয় যোগসূত্র থাকলেও ‘বোধ’ শব্দটি আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। বুদ্ধি বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেই সেটি শুদ্ধ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম বুদ্ধি প্রকাশে সহযোগিতা করে। অন্নময়

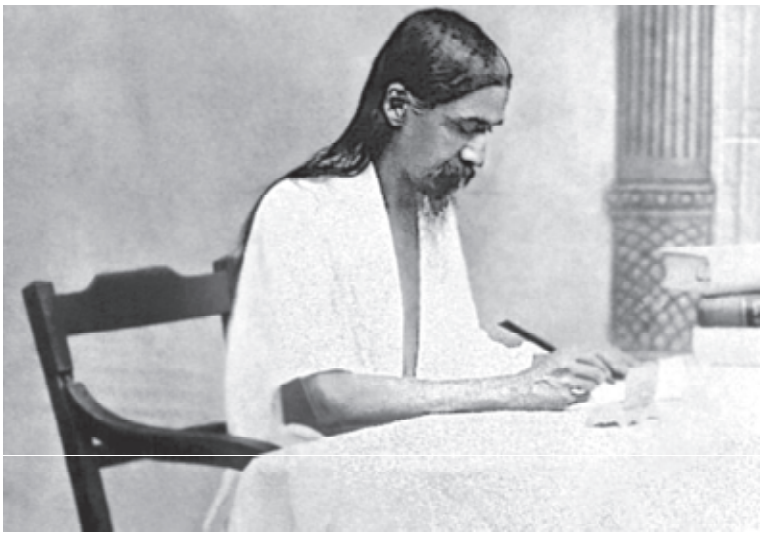

কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ হয়ে আমরা তখন আনন্দময় কোষে স্থিত হই। এই আনন্দময় কোষে স্থিত হলেই আমরা প্রকৃতরূপে অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের যোগসূত্রটিকে অনুধাবন করতে পারি। নিঃস্বার্থ দেশসেবায় নিজেকে নিমজ্জিত করতে গেলে নিজের গর্ভধারিণী মা, ভারতমাতা ও জগন্মাতা, এঁরা তিনে এক, একে তিন– এই বোধকে আত্মস্থ করতে হয় এবং তা করতে গেলে মন, বুদ্ধি ও দেহের আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রয়োজন। সেই স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধি ভিন্ন দেশসেবায় যুক্ত হতে গেলে সেই দেশসেবকের দেশসেবায় এক বিরাট ফাঁকি থেকে যায় এবং সে পথ দিয়েই প্রবেশ করে স্বার্থবুদ্ধির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির অনুপ্রেরণা। তাই শুদ্ধ দেশসেবায় নিমজ্জিত হতে গেলে নিজের ছোটো 'আমি'কে বিসর্জন দিয়ে নিজের মধ্যে স্থিত বড়ো 'আমি'কে উপলব্ধির মাধ্যমে জাগ্রত করতে হবে এবং সে কর্মে সফল হলে তবেই প্রকৃত দেশসেবক হওয়া সম্ভব। স্বাধীনতার পূর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দ সে পথেই আমাদের দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। মানুষ তার ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে যদি বৃহতের পূজায় নিজেকে নিমজ্জিত করতে চায়, তবে অধ্যাত্মবোধের প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অতীত আমাদের 'হাটের মানুষ' হওয়ার শিক্ষা দেয় না যেখানে একে অপরকে ক্ষুদ্র প্রমাণ করে, সীমাবদ্ধতার কদর্য রূপটি নিয়ে চর্বিতচর্বণ করে, ইতর প্রকৃতির প্রমাণ রেখে, পদলোভ, স্বার্থলোভ, অর্থলোভ ও রাজ্যলোভের দ্বারা চালিত হয়ে ঠেলাঠেলি বা চিৎকারের মাধ্যমে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে পাঁচজনকে পিছনে ফেলে অগ্রসর হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টার স্পৃহা জাগরণ করে সেই পথে দেশসেবায় নিয়োজিত হতে গেলে শুধুমাত্র পাণ্ডিত্যের মাধ্যমেই সেবক কৃতকৃত্য হতে পারবেন না। কারণ শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য তাকে মোহমুক্তির দর্শনে দীক্ষিত করে না। আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমে যখন ম্যাকিয়াভেলি হাঁটছেন, ভারতবর্ষে তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগ। একইভাবে পশ্চিমে যখন কার্ল মার্কসের কমিউনিস্ট দর্শনের চর্চা চলছে, ভারতবর্ষ তখন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। এর মধ্য থেকে ভাতরবর্ষের ভাবটি বুঝতে হবে। স্বাধীনতার পূর্বে শুধু ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগের অন্ধকারময় কালের করালগ্রাসের মধ্যেও ভারতবর্ষে ঈশ্বরকোটীর এক একজন মহাসাধক আবির্ভূত হয়েছেন ও ভক্তিভাব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে আক্রমণকারীর ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করেছেন। আদি শঙ্করাচার্যের মত ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পথ—এই দুই ধারার সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের মূল ভাবটি রচিত হয়। এই ভাবই পরবর্তী সময়ে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধের ভিত্তি রচনায় সহায়তা করে। আদি শঙ্করাচার্যের মতের মধ্য দিয়ে শাশ্বত সনাতন বৈদিক ধারার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয় ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পথের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজে সমরসতার ধারা জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

ভারতবর্ষ পুনরায় তার সনাতন ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। বঙ্গে দীর্ঘকাল নিরীশ্বরবাদের প্রকোপ থাকার কারণে বিস্মৃতি তাকে গ্রাস করেছে। হিন্দু বাঙালি স্বাধীনতা উত্তরকালে সনাতন ভাবকে আত্মস্থ করে যদি আধ্যাত্মিক ভারতের অধ্যাত্মবোধের যাত্রাকে বোঝার চেষ্ট করতো তাহলে বিজাতীয় নিরীশ্বরবাদের প্লাবনে প্লাবিত না হয়ে শাশ্বত সনাতন ভারতবর্ষের ভাবে অনুপ্রাণিত হতো। আমরা অনেকেই ভুলে গিয়েছি চন্দ্রনাথ বসুর কথা যিনি ১৮৪৬ সালে হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও ইতিহাসে প্রথম 'হিন্দুত্ব' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং তার উপর বইও রচনা করেছিলেন। তার বহু পরে বীর সাভারকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দুত্বের ভাবধারাকে গ্রহণ করেছিলেন। সর্বভারতীয় স্তরে সমগ্র হিন্দু মঠ, মিশন ও মন্দিরকে একটি ছত্রছায়ায় আনার প্রচেষ্টা করেছিলেন স্বামী চিন্ময়ানন্দজী মহারাজ। তিনিই ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঠনের পুরোহিত।

অধ্যাত্মবোধের অনুধ্যানে রাষ্ট্রগঠনে বৈদিক ভাবের ধীশক্তির সঙ্গে মানুষের আত্মশক্তিকে যুক্ত করে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, দেশসেবায় ব্রতী হয়ে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন বীর সন্তানরা। প্রারম্ভে শ্রদ্ধার দ্বারা ব্রহ্মচার্য ব্রত, মধ্যমে সংসারে আশ্রমের মনকে ধরে রেখে মঙ্গলকর্মে রত থাকা তৎপরবর্তীকালে ক্রমশ সংসার বন্ধন শিথিল করে অমৃতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আকুতিকে জাগ্রত করা ও অবশেষে মোক্ষের সন্ধানে রত হয়ে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে বিলীনের পথে এগোনো—এই ছিল, আজও আছে ভারতবর্ষের মূল রীতি ও চিরসনাতন নীতি। অধ্যাত্মবোধ ও ধর্ম সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবোধ সম্পর্কে নিজ চেতনা বৃদ্ধি করতে গেলে এই ভাবকে অন্তরে ধারণ করে অগ্রসর হতে হবে যেমনভাবে এগিয়ে এসে হুতাত্মা হয়েছিলেন বীর ভারত সন্তানরা স্বাধীনতার পূর্বে।

ধর্মের উদার সর্বংসহা ও সর্ববহা ভাবকে অন্তরে ধারণ করে, নিজেদের অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করে, সীমার মাঝে অসীমকে অনুভব করে, নির্লোভ ভাবে নিষ্কাম কর্মে ব্রতী হওয়ার দীক্ষা নিয়েছিল আধ্যাত্মিক ভারত। সেই ভাবালয়ে সমস্ত সীমাবদ্ধতার মহৌষধ রূপে আমাদের বৈদিকধর্ম যেভাবে ত্যাগ, বৈরাগ্য, দয়া ও প্রেমভাবের মধ্য দিয়ে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূল অর্থ উপলব্ধির মাধ্যমে মহাজীবনে উত্তরণের মন্ত্রদীক্ষা দেয় তা সর্বজীবের মধ্যে ব্রহ্মগুণের জাগরণ করে, রজোগুণকে ব্রহ্মগুণের দ্বারা পরিচালিত করে ও তমোগুণকে নাশ করে সর্বজীবের মধ্যে শিবদর্শনের সাহায্যকারী বহুজনের জন্য কল্যাণকর ও সুখদায়ী রাজনীতি যা রাজার নীতি নয়, নীতির রাজার ভাবের সূচনা করে। □

স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুরের অবদান

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

ঐতিহাসিক মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিদগ্ধ ভারতীয় সমাজে আজও সমাদৃত। স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুস্থল ও অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের ভূমি হিসেবে ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলি খ্যাত, মেদিনীপুর তাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কথিত আছে, তৎকালীন বাঙ্গলার যেসব অঞ্চলের উত্তাল স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁদের ভাবিত করেছিল, সেইসব অঞ্চলের উপদ্রব থেকে বাঁচতে তাঁদের অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব অঞ্চল দিল্লিতে গমন। মেদিনীপুর ছিল এইসব অঞ্চলের মধ্যে অগ্রগণ্য। শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনই নয়, মধ্যযুগীয় সময় থেকেই মোগল, পাঠান-সহ বিভিন্ন বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে প্রতিবাদী মেদিনীপুর। স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা তৎকালীন মেদিনীপুরের বীর সন্তানদের মননে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে মেদিনীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চল ও গঞ্জের অসংখ্য যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল এবং তাঁদের আত্মত্যাগ এবং আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশের বিকৃত ইতিহাস বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকেই স্থান দেয়নি। আমাদের যুবসমাজ জানে না হয়তো-বা তাঁদের গ্রামে অথবা পাশের গ্রামে নয়তো-বা পাশের বাড়িতেই একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী জন্মেছিলেন যিনি তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সহভাগী হয়েছিলেন।

মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলন মূলত সশস্ত্র আন্দোলনের ঘরানা হিসেবেই পরিচিত — যে আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ক্ষুদিরাম বসু-সহ বিমল দাশগুপ্ত, জ্যোতিজীবন ঘোষ, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, প্রভাতাংশু পাল, মৃগেন দত্ত, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মল জীবন ঘোষ প্রমুখ। এর মধ্যে নির্মল জীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়-সহ অনেকেই সুভাষ চন্দ্র বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলে যোগ দিয়ে মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু যদি মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শুধু সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখি, তাহলে সত্যের অপলাপ হবে। উত্তাল সশস্ত্র আন্দোলনের মাঝেও স্বমহিমায় ভাস্বর ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। যিনি 'গান্ধীবুড়ি' নামে খ্যাত। তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহের সংস্কৃতি আজও মেদিনীপুরবাসী তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর মনের মণিকোঠায় অম্লান। যিনি ব্রিটিশ পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়েও হাত থেকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি। প্রকৃতপক্ষে সহিংস ও অহিংস — স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি ধারাকেই তৎকালীন মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ঋদ্ধ করেছিল। কোনও একটি আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে সর্বাগ্রে যেটি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সেই আন্দোলনে যোগদান। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনের রূপ দিতে যে প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল, সেটি হচ্ছে তৎকালীন জিলা স্কুল বা বর্তমান মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল। মেদিনীপুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এই প্রতিষ্ঠানটি। হেমচন্দ্র কানুনগোর মতো এই বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষকরা শিক্ষাদানের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। ক্ষুদিরাম ও তার সহযোগীরা মেদিনীপুর শহরের অলিগলিতে গিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ব্রিটিশ পুলিশের ঘেরাটোপে ক্ষুদিরাম বসু

সংবলিত পুস্তিকা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করতেন এবং ব্রিটিশ শাসককে বিতড়ন করার জন্য তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা প্রার্থনা করতেন। গোপনে এইকাজ করতে গিয়ে ১৯০৬ সালে তিনি ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও তিনি দমে যাননি। জেলাশাসক কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হন এবং ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট তাঁর ফাঁসি হয়।

ক্ষুদিরাম-পরবর্তী অধ্যায়ে দেশমাতৃকার বীর বিপ্লবী সন্তান প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, প্রভাতাংশু পালের জন্ম হয় দাসপুর থানার খঞ্জাপুরে। দুই বন্ধু মিলে মেদিনীপুর জেলার হিজলীতে নিরস্ত্র বন্দিদের উপর গুলি চালনা ও হত্যার প্রতিবাদে তৎকালীন জেলাশাসক ডগলাসকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রদ্যোতের পিস্তল থেকে গুলি বেরোয়নি যান্ত্রিক ত্রুটিতে কিন্তু প্রভাতাংশু অব্যর্থ নিশানায় লক্ষ্যভেদ করেন ও পলায়ন করেন। কিন্তু প্রদ্যোত পুলিসের হাতে ধরা পড়েন ও মাত্র ১৯ বছর বয়সে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের সমসাময়িক চরমপন্থী আন্দোলনের আর এক পুরোধা ছিলেন সত্যেন বসু। মেদিনীপুরের সন্তান সত্যেন আলিপুর জেলে এক রাজসাক্ষীকে হত্যা করে কারাবরণ করেন এবং পরে তাঁর ফাঁসি হয়। মেদিনীপুর জিলা স্কুলের শিক্ষক হেমচন্দ্র কানুনগো শিক্ষকতার পাশাপাশি চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'ক্ষুদিরাম বোমা মামলা'-য় জড়িয়ে পড়েন ও পরে বিচারে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। এছাড়াও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজকিশোর চৌধুরী, মেদিনীপুর টাউন স্কুলের ছাত্র অনাথবন্ধু পাঁজা প্রমুখ বিপ্লবীর আত্মাহুতি মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করেছে।

দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে গেরিলা কায়দায় ব্রিটিশ পুলিশ ও সেনার বিরুদ্ধে আন্দোলন ও আক্রমণ মেদিনীপুরের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনকে অভিনবত্ব দান করছিল। আর এই গেরিলা আক্রমণ যিনি সংগঠিত করেছিলেন তাঁর নাম সর্দার অচল সিংহ। তিনি ছিলেন গড়বেতার বগড়ী রাজ বংশের আত্মীয়। বগড়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গজপতি সিংহের উত্তরাধিকারী ছত্র সিংহকে ইংরেজরা সিংহাসনচ্যুত করার পর সর্দার অচল সিংহ তাঁর হাজার হাজার পাইক বাহিনী নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রায় ১০ বছর লড়েছিলেন। শালবনের আড়াল থেকে অভ্রান্ত লক্ষে ইংরেজ সেনাদের তীরবিদ্ধ করত অচল সিংহের পাইক বাহিনী। তাঁর তীব্র আক্রমণে নাস্তানাবুদ হয়ে গড়বেতার গনগনির ডাঙ্গায় কামান বসিয়ে বিস্তীর্ণ সালের জঙ্গলে আগুন ধরিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ। পরে বিশ্বাসঘাতক ছত্র সিংহই ব্রিটিশ পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেয় অচল সিংহকে। এরপর ব্রিটিশ সেনা অচল সিংহ ও তাঁর শত শত অনুগামীকে শালগাছের সঙ্গে দড়ি লাগিয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। মেদিনীপুরের প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে উঠেছিল মধ্যযুগে মোগল আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও। ঘাটালের বরদা অঞ্চলের রাজা শোভা সিংহ, চন্দ্রকোণার রঘুনাথ সিংহ এবং বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহের যৌথ আক্রমণে মোঘল সেনারা পিছু হঠেছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গনারীদের যোগদান যতটা ব্যাপক ছিল, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের যোগদানের ব্যাপকতা তুলনায় কম ছিল। যে নারীর নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রাজবংশের রানি শিরোমণি। ইংরেজ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি উপজাতিদের সংগঠিত করে বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, যে বিদ্রোহ ইতিহাসে 'চুয়াড় বিদ্রোহ' হিসেবে খ্যাত। চারুশীলা দেবী চন্দ্রকোণার কুয়াপুর গ্রামে জন্মেছিলেন এবং পরে তাঁর বৈপ্লবীক কর্মকাণ্ড চন্দ্রকোণা, কেশপুর, মেদিনীপুর শহর, ডেবরা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়েছিল। সুতাহাটার চারুশীলা জানার ১৯৩২-এর 'লবণ আইন অমান্য' আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। মেদিনীপুরের স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন এই অঞ্চলের ভূমিপুত্র কিছু জমিদার, যাঁদের দেশপ্রেম ও দানশীলতা সর্বজনবিদিত। মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোল অঞ্চলের রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁ স্বদেশীদের অর্থ সাহায্য করতেন, এমনকী তাঁর পুত্রও দেবেন্দ্র স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে গোপগড়ের যে ভবনটিতে বর্তমানে রাজা নরেন্দ্র নামাঙ্কিত মহিলা মহাবিদ্যালয়ের পঠনপাঠন হয়, ওই ভবনটি একসময় স্বদেশীদের আখড়া ছিল। ওই ভবনের অদূরেই জঙ্গলের মধ্যে একটি বোমা তৈরির কারখানা ছিল, যেখানে তৈরি বোমা বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছত।

মাতঙ্গিনী হাজরা

হেমচন্দ্র কানুনগো

বীরেন শাসমল

প্রদ্যোত ভট্টাচার্য

দেশপ্রাণ বীরেন শাসমল, সুশীল ধাড়া, অজয় মুখোপাধ্যায়, মাতঙ্গিনী হাজরাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার কাহিনি ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছেই। কিন্তু আমরা এই ছোট্ট পরিসরে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার চেষ্টা করলাম সেই সব বীর নায়কদের, যাঁরা ইতিহাসের পাতায় স্থান পাননি। তা সত্ত্বেও বসন্ত সরকার, সুবোধবালা কুইতি, গণেশ চন্দ্র দাস, ক্ষিরোদ নারায়ণ ভুইয়া, বসন্ত দাস, অতুল বসু, কার্তিক মিত্র এবং যাঁদের কথা বিশদে বলা গেল না ও যাঁদের নামোল্লেখ একেবারেই সম্ভব হলো না, তাঁদের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। □

ACC LOGISTICS

Fleet Owners & Transport Contractors

Registered Government Contractor

40, Girish Park (North),

1st Floor, Suit # 01

Kolkata - 700 006
(Near Calcutta Medicos)

Phone : +91 33 40726528, 40036528 E-mail : ashok@acclogistics.in

URL : www.acclogistics.in

An ISO 9001:2008 Company

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবী
বটুকেশ্বর দত্ত

অধুনা পূর্ব বর্ধমানের ওয়ারি গ্রামে জন্ম বটুকেশ্বর দত্তের। ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল ভগৎ সিংহের সঙ্গে নয়া দিল্লীর কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা ফাটানোর জন্য তিনি পরিচিতি লাভ করেন। পরিকল্পনামাফিক তাঁরা দুটি বোমা ফেলেন, যাতে কারো কোনো ক্ষতি না হয়। ভগৎ সিংহের বক্তব্য ছিল 'বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন'। বটুকেশ্বর দত্ত ও তিনি ইস্তাহার ছড়িয়ে নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে স্লোগান দেন এবং গ্রেপ্তারবরণ করেন। গ্রেপ্তারের পর বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যা প্রচেষ্টার দায়ে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে ব্রিটিশ সরকার। জেলে তিনি এবং ভগৎ সিংহ ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দিদের সঙ্গে নোংরা আচরণের বিরুদ্ধে ও রাজবন্দির অধিকারের দাবিতে এক ঐতিহাসিক অনশনের উদ্যোগ নেন এবং বন্দিদের জন্য কিছু অধিকার আদায়ে সক্ষম হন। এই অনশনে প্রাণত্যাগ করেন বিপ্লবী যতীন দাস।

১৯৩৮ সালে বটুকেশ্বর দত্ত মুক্তি পেলেও বাংলা, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। ১৯৪২ সালে আবার গ্রেপ্তার করে তাকে অন্তরীণ রাখা হয় ৩ বছর। তিনি হিন্দুস্তান সমাজ প্রজাতান্ত্রিক সংস্থার সদস্য ছিলেন। কানপুরে কলেজে পড়ার সময় বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ ও ভগৎ সিংহের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী রাজনীতিতে যোগ দেন। বিপ্লবী সদস্যদের কাছে বি. কে. নামে পরিচিত ছিলেন বটুকেশ্বর। এই সর্বস্বত্যাগী বিপ্লবীর শেষ জীবন বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক। টিবি রোগাক্রান্ত হওয়ায় জেল থেকে মুক্তি পেলেও স্বাধীন ভারতে তার মূল্যায়ন হয়নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে জীবন কেটেছে তার।

স্বাধীনতার পর বিয়ে করে বিহারের পাটনায় বসবাস করতেন। সরকারি সাহায্য বা সম্মান বিশেষ কিছু পাননি। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পরিবহণ ব্যবসা শুরু করেন। ২০ জুলাই ১৯৬৫-তে দিল্লির একটি হাসপাতালে প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে তার মৃত্যু হয়।□

With best Compliments from :

তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য জাতির জড়বাদ-সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিনপুরুষ যাইতে না যাইতেই বিনষ্ট হইবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ (৫/৪৬)

BHARAT STEEL INDUSTRIES

190, Girish Ghosh Road, Belurmoth, Howrah
Pin- 711 202

With Best Compliments From -

South Calcutta Diesels Pvt. Ltd.

Sales & Service

225-D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone : 2302-5250/ 3/ 4, Fax : 033-2281-2509 / 2287-6329,

E-mail : scdtodi@scdtodi.com

Authorised Dealers of

BOSCH LTD. BOSCH, GMBH-GERMANY,

DEUTZ, A. G., GERMANY

LOMBARDINI - ITALY, V. M. MOTORI - ITALY

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

খেরওয়াড় বিদ্রোহের নায়ক

বাবা তিলকা মাঝি

তিলকা মুর্মু ছিলেন জনজাতি বিদ্রোহের প্রথম যুগের নেতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর বাবা চুনু মুর্মু ছিলেন গ্রাম প্রধান। ভাগলপুরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যে 'খেরওয়াড় বিদ্রোহ' হয় তার নেতৃত্ব দেন তিলকা। ১৭৮১-৮৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমি লুঠ করে, বলপূর্বক খাজনা আদায়ের নির্মম পন্থা অবলম্বন করে। তাকে কেন্দ্র করে দরিদ্র সাঁওতালদের মধ্যে জমে ওঠা তীব্র ক্ষোভকে গণ বিদ্রোহের আকার দেন তিলকা। তাকে 'বাবা তিলকা মাঝি' নামে ডাকতো বিদ্রোহের অনুসারীরা। এই দীর্ঘ আন্দোলনে বহু সাঁওতাল প্রাণ বলিদান করেন। ১৭৭৮ সালে তেরশো জন সাঁওতাল বিদ্রোহী নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রামগড় ব্যাটেলিয়ন কবজা করেন তিলকা। কোম্পানির ট্রেজারি কুঠি লুঠ করে জনগণের মধ্যে বিলিয়ে দেন তিনি। ১৭৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভাগলপুরের ইংরেজ কালেক্টর অগাস্ট ক্লিভল্যান্ড মারা গেলে তিলকপুরের জঙ্গলে ইংরেজ সেনাবাহিনী তিলকা ও তার সাথীদের ঘেরাও করে। এই সংগ্রামে আহত অবস্থায় তিলকা মুর্মু ধরা পড়েন। বিদ্রোহের শাস্তিস্বরূপ তাকে ছুটন্ত ঘোড়ার পেছনে বেঁধে দেওয়া হয়। এই নৃশংস পদ্ধতিতেও তাঁর মৃত্যু না হলে তিলককে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ভাগলপুর শহরে।

ছোটোবেলা থেকেই ইংরেজদের ভয়াবহ অত্যাচারের সাক্ষী ছিলেন তিলকা। নিজের পরিবার-সহ সাধারণ সাঁওতালদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচারই ছিল তাঁর বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণ। কোম্পানির সেনাপ্রধান ক্লিভ ল্যান্ড এবং স্যার আইরে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তিলকাও তার যোগ্য জবাব দেন। সাঁওতাল বাহিনীর তিরের আঘাতে ইংরেজ সেনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তিলকা তালগাছের মাথায় চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। এই সময় ক্লিভ ল্যান্ডকে ঘোড়ায় চড়ে সেদিকেই আসতে দেখা যায়। তিলকার তির মুহূর্তের মধ্যে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয় ক্লিভ ল্যান্ডের বুক। এই ঘটনার পর তিলকারা যখন উৎসবে মেতে উঠেছেন, ঠিক তখনই ইংরেজ সেনা অতর্কিতে হানা দেয়। বিশ্বাসঘাতকতা করে জাউদা নামের সাঁওতাল সমাজেরই একজন। বহু সাঁওতাল মুখোমুখি সংঘর্ষে মারা যান। অনেককে গ্রেপ্তার করে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেয় ইংরেজরা। জঙ্গলে পাহাড়ে আত্মগোপন করে কিছুদিন ইংরেজ সেনার বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যান তিলকা। কিন্তু একসময় ধরা পড়ে যান।□

ফ: ৩

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলা

গৌতম কুমার মণ্ডল

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হতে চলল। এই উপলক্ষ্যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও নানা দিক থেকে, নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। এ চেষ্টা নিশ্চয়ই সাধুবাদ যোগ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামে লাল-বাল-পাল, দেশবন্ধু, গান্ধীজী, সুভাষ, নেহেরু, প্যাটেল প্রমুখ বহু মানুষ নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু এঁরা সবাই ছিলেন শিক্ষিত ও নাগরিক মানুষ। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে দলে দলে যারা ব্রিটিশ বিরোধী নানা আন্দোলনে রাস্তায় নেমেছেন, পুলিশের মার খেয়েছেন, অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন, কারাগার ভরিয়ে তুলেছেন....তাঁরা কারা? তাঁরা লক্ষ লক্ষ অনাগরিক মানুষ, গ্রাম-গঞ্জ-মফস্‌সলের শিক্ষিত অল্প-শিক্ষিত দেশপ্রেমী সাধারণ মানুষ। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ধারার ইতিহাসে এঁদের কথা আড়ালেই থেকে গেছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরের জেলা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া। ইংরেজদের আগমনের অনেক আগে থেকেই। মল্লভূম আর পঞ্চকোটের রাজবংশ জেলা দুটির বেশিরভাগ এলাকা কয়েকশো বছর ধরে শাসন করেছেন। প্রজাদের মনে রাজার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির কোনও অভাব ছিল না। রাজারাও ছিলেন প্রজা-হিতৈষী। ব্যাপারটা বদলে গেল ইংরেজ আগমনের পর। বিষ্ণুপুর রাজ এলাকা-সহ গোটা মানভূমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব শুরু হলো ১৭৬৫ খ্রিঃ নাগাদ। আর বেড়ে চলল খাজনা আদায়ের পরিমাণ। ১৭৭০-৭১ খ্রিঃ মন্বন্তরের বছরেও বিষ্ণুপুর রাজ এলাকা থেকে খাজনা আদায় হয় ২,৮০,৫০১ টাকা যা আগের বছরের থেকে ৩০ হাজার টাকা বেশি। ক্রমশ খাজনা আদায়ের পরিমাণ বাড়তে থাকে। গ্রামের মানুষের জীবনে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুর্দশা। রাজারাও অসহায় হয়ে পড়েন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই দুই জেলার প্রাচীন ভূস্বামী রাজারা তাঁদের রাজত্বও হারাতে থাকেন। ১৮০৬ খ্রিঃ বর্ধমানের মহারাজা তেজ চাঁদ বাহাদুর মল্ল রাজবংশের রাজত্ব কিনে নেন। ১৭৯৫ খ্রিঃ পঞ্চকোটের রাজা নীলমণি সিংহ দেবের রাজত্ব কিনে নিয়েছিলেন কলকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তি নীলমণি দত্ত। পাতকুম আর তামারের রাজার ইংরেজ বিরোধী ভূমিকায় সমর্থন ছিল বাঘমুণ্ডির রাজার। ফলে বাঘমুণ্ডির রাজার জমিদারির একটা অংশ ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে। একদিকে খাজনা আদায়ের নামে শোষণ আর অন্যদিকে রাজাদের আত্মগরিমায় এ জাতীয় আঘাত প্রজাদের দুঃখী এবং পরিণামে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। নানা বিদ্রোহে বাঁকুড়া না হলেও মানভূম জেলা অস্থির হয়ে ওঠে।

শিল্পগ্রাম, পুরুলিয়া

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকেই জ্বলে ওঠে চুয়াড় বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহের আগুন। প্রজাদের স্বার্থে বরাভূমের রাজা বিবেকনারায়ণ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে চুয়াড় বিদ্রোহের আগুন লাগিয়েছিলেন (১৭৬৯ খ্রিঃ) তখন তাতে যোগ দিয়েছিলেন মানভূমের রাজা হরিনারায়ণ। চুয়াড় বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল রাজাদের আত্মগরিমা আর স্বাধীনতায় আঘাত। বিদ্রোহে এক হয়েছিলেন মানভূম, বরাভূম, পাতকুমের রাজারা। চুয়াড় বিদ্রোহের রেশ কাটতে না কাটতেই মানভূমে ছড়িয়ে পড়ে পাইক বিদ্রোহ (১৭৭১ খ্রিঃ)। এ আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল মানভূম, বরাভূম, ধলভূম, কুইলাপাল, ধাদকি প্রভৃতি রাজা ও জমিদারদের এলাকায়। ১৭৮৪ সাল নাগাদ বহু অত্যাচার ও নির্যাতনের পর পাইক বিদ্রোহ ব্রিটিশ

শক্তি দমন করে। কিন্তু এ আগুন থেকেই বিরসা মুণ্ডা শুরু করেন উল-গুলানের নতুন আন্দোলন। যার প্রেক্ষিত ছিল আরও বড়ো। এর ফলে ব্রিটিশরাজ এখানকার রাজাদের সঙ্গে খানিকটা আপোশ-মীমাংসায় আসতে বাধ্য হয়। পাঞ্চেত রাজ এস্টেটের নিলাম বাতিল করে রাজার হাতেই ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাঘমুণ্ডির রাজার বাজেয়াপ্ত করা তালুক ফিরিয়ে দিতে তাঁরা বাধ্য হন। ইংরেজ শক্তির এই নমনীয় হয়ে ওঠার পিছনে মূল কারণ ছিল মানভূম জেলার সাধারণ মানুষের রাজাদের হয়ে, রাজাদের সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই।

ইংরেজরা আপোশ করলেও মানভূম শান্ত থাকেনি। এর কিছুদিন পরই ছড়িয়ে পরে 'গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামা' (১৮৩২-৩৩)। বরাবাজার থেকে আকরো, অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা প্রভৃতি বহু জায়গায় কাঁপন ধরায় এই হাঙ্গামা। গঙ্গানারায়ণ হাঙ্গামাকে চুয়াড় বিদ্রোহের শেষ পর্ব বলা হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মানভূমে যখন নানা বিদ্রোহ হাঙ্গামা থেকে থেকেই উঠছে তখন বাঁকুড়া কিন্তু অনেকটাই শান্ত। জেলার মানুষ শোষিত হয়েছে, খাদ্যসঙ্কট তীব্র। ১৮৬৫-৬৬ খ্রিঃ বিষ্ণুপুর শহর সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল। তাদের দেহ সৎকার করার মতো সামর্থ্যও পরিজনদের ছিল না। দেহ রাস্তায় পড়ে ছিল। নিজেদের ঐতিহ্যশালী মল্লভূম রাজের রাজত্ব চলে গেছে অন্যের হাতে, কিন্তু প্রজারা ক্ষেপে ওঠেনি, সেরকম কোন প্রতিবাদও নেই। অদ্ভুত শান্ত এই জেলা। জেলার শান্তিপ্রিয় মানুষ সম্পর্কে ১৮৩৮ সালে এইচ সি হ্যালকেট নামের এক আমলা জেলাশাসককে চিঠিতে লিখছেন—"The population of this district is generally extremely poor and their condition wretched–suffering under severe from scarcity–I only wonder that under such circumstances they remain so quiet and well behaved as they do." (West Bengal District Recrods. New Series, Bankura District Letter issued (1802-1869) Ed. By Sukumar Sinha and Himadri Banerjee, Page XXII).

বাঁকুড়া জেলায় অনেক সাঁওতাল জনজাতির বাস। কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) কোনো প্রভাব এ জেলায় ছিল না। বরং বীরভূম থেকে দলে দলে সাঁওতালেরা এ সময় এই নিরুপদ্রব শান্ত জেলায় জীবিকার সন্ধানে এসে এখানেই বসতি গড়েছে। অরণ্য অধ্যুষিত দক্ষিণ বাঁকুড়ার বহু জমি এদের পরিশ্রমেই চাষযোগ্য হয়েছিল। কিন্তু মহাজনদের শোষণ, উচ্চবর্ণের মানুষদের ফন্দিবাজিতে চাষের জমি শেষ পর্যন্ত এদের হাতে থাকেনি। এঁরা দরিদ্রই থেকে গিয়েছেন। কিন্তু প্রতিবাদ দানা বাঁধেনি।

২

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঁকুড়া জেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ শতকের একেবারে প্রথম পর্বে। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ। এর প্রতিবাদে সারা বাঙ্গলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন। বাঁকুড়াতেও এই আন্দোলনের প্রভাব দেখা দেয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো বিখ্যাত নেতারা এই সময় বাঁকুড়ায় বিলাতি চিনি ব্যবহার প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কোতুলপুর, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া শহর— এইসব জায়গায় স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। কোতুলপুরের পাঠশালার শিক্ষক ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের বিলিতি কাপড় পরে পাঠশালায় আসতে দিতেন না। ছাত্রদের বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের কাপড় পরতে উৎসাহিত করা হতো। একটি তথ্য থেকে জানা যায় ১৯০৭-০৮ সালে এ জেলায় স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য বাইশ-তেইশ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী

স্বদেশি আন্দোলনের হাত ধরেই বাঙ্গালায় শুরু হয়ে যায় বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা। এই ধারার সূত্রপাত যার হাত দিয়ে, তিনি হলেন বিপ্লবী রামদাস চক্রবর্তী (১৮৮৭-১৯৪৭)। তিনি রামদাস পালোয়ান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর একটি কুস্তির আখড়া ছিল বাঁকুড়া শহরের কালীতলার কাছে। ইংরেজ পুলিশ বাহিনীর সদস্য হয়েও যেভাবে রামদাস বাঁকুড়ায় ইংরেজ বিরোধী বিপ্লবী কাজকর্মে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। তাঁর আখড়াতেই এক রাত্রির জন্য বিপ্লবী কাজে এসেছিলেন বিখ্যাত বিপ্লবী বারীন্দ্রনাথ ঘোষ। রামদাসের আখড়া কিছুদিনের মধ্যেই বাঁকুড়ার বিপ্লবী আন্দোলনের আঁতুড়ঘর হয়ে ওঠে। রামদাসের আখড়াকে কেন্দ্র করেই সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বিজয় চন্দ্র আইচ, গোকুল কবিরাজ প্রমুখ বিপ্লবী একত্রিত হন। আলিপুর বোমা মামলার রাজসাক্ষী বিপ্লবী নরেন গোসাঁইয়ের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রামদাস পালোয়ানের সাংগঠনিক ক্ষমতার কথা। অস্ত্র কেনার জন্য তাঁরা ডাকাতি করার পরিকল্পনা করেন। হিড়বাঁধের জনৈক মোহান্তের বাড়িতে ডাকাতির নির্দেশ আসে কলকাতা থেকে। কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। অম্বিকানগর রাজবংশের সন্তান রাইচরণ ধবলদেব ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনিও বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০৭-০৮ সালে রানিবাঁধের জঙ্গল ঘেরা এক জায়গা ছেঁদাপাথরে বিপ্লবীরা প্রশিক্ষণের এক গোপন কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গেও ছেঁদাপাথরের কেন্দ্রটির যোগাযোগ ছিল। নরেন গোসাঁইয়ের সাক্ষ্যের কারণে ছেঁদাপাথরে পুলিশি তল্লাশি হয়। রামদাস পালোয়ান, রাইচরণ ধবল দেব প্রমুখ বাঁকুড়ার বহু বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়ে যান।

এরপর ১৯২২ সালে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল স্থাপিত হলে জেলায় বিপ্লবী কাজকর্ম আবার শুরু হয়। এই স্কুলের ছাত্র হয়ে চট্টগ্রাম থেকে এসেছিলেন যোগেশ দে নামের এক বিপ্লবী। তিনি রাজগ্রামে বিবেকানন্দ লাইব্রেরি নামে এক পাঠাগার গড়ে তোলেন। সেখান থেকে সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে থাকেন। তিনি চলে যাবার আগে প্রফুল্ল কুমার কুণ্ডু, সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য, জয়কৃষ্ণ দাসকে নিয়ে অনুশীলন দলের একটি গোষ্ঠী তৈরি করে দিয়ে

যান। ১৯২৮ সালে বিখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলিকে পুলিশ নজরবন্দি করে বাঁকুড়ার কালীতলার একটি বাড়িতে রেখেছিল। এই বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসে সর্বেশ্বর ভট্টাচার্য, জয়কৃষ্ণ দাস, শিশুরাম মণ্ডল প্রমুখ বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য হয়েছিলেন। এই দল জেলার নানা জায়গায় বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে।

বাঁকুড়া জেলায় বিপ্লবীদল গড়ে তোলা এবং যুব সমাজকে সংগঠিত করার জন্য জেলার বাইরে থেকে এখানে এসে থেকেছেন বহু বিপ্লবী। এঁদের মধ্যে যাঁদের কথা না বললেই নয় তাঁরা হলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, চট্টগ্রাম থেকে আসা নীরদ বরণ দত্ত, তারানাথ লাহিড়ী ও বারাণসী থেকে আসা শচীন সান্যাল। বিপিন বিহারী এই জেলায় অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য তিনি শালতোড়া, বেলিয়াতোড়, রাধানগর প্রভৃতি নানা জায়গায় মিটিং করেছেন। এইসব বিপ্লবীদের জন্যই ১৯২০-৩২ সাল সময় পর্বে বাঁকুড়ার বিপ্লবী আন্দোলন নানাভাবে সংগঠিত হয়েছে। ১৯৩১ সালে বাঁকুড়ার পুলিশ সুপারকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পরের বছর বিষ্ণুপুরের মহাকুমা শাসককে হত্যার ছক কষা হয়। কিন্তু সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। মনে করা হয় বিপ্লবী দলের মধ্যেই পুলিশের গুপ্তচর ছিল। এরপর থেকে বাঁকুড়ার বিপ্লবী আন্দোলনের ধারা দুর্বল হয়ে পড়ে।

বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঁকুড়া জেলায় সক্রিয় ছিল গান্ধীবাদী কংগ্রেসের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাঁকুড়া ওয়েসলিয়ান কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক অনিল বরণ রায় (১৮৮৮-১৯৭৪), অমর কানন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ, বিশিষ্ট দেশপ্রেমী ও মাড়োয়ারি বণিক তথা দানবীর মোহনলাল গোয়েঙ্কা, জেলার নারী আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী শান্তশীলা পালিত প্রমুখ। অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিকায় অনিল বরণ রায় ও গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ গঙ্গাজলঘাটির মধ্য ইংরেজি স্কুলকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। এই সময় জেলার নানা প্রান্ত থেকে ইংরেজি স্কুল, আইন আদালত ত্যাগ করে বহু মানুষ জাতীয় আন্দোলনে অংশ নেন। সোনামুখী ও বিষ্ণুপুরেও গড়ে ওঠে জাতীয় বিদ্যালয়। বিশিষ্ট সংস্কৃত পণ্ডিত আশুতোষ বিশ্বাস সোনামুখীর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন। মোহনলাল জেলার নানা জায়গায় স্কুল স্থাপন করার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে থাকেন। বহু ছাত্র সরকারি স্কুল ছেড়ে এইসব জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সরকারি আদালতের পরিবর্তে কংগ্রেস কর্মীরা বহু জায়গায় সালিশি আদালতের মাধ্যমে জেলার মানুষের বিরোধ মেটাতে থাকেন। ১৯২৮-৩০ সালে সরকারি মদতপুষ্ট জেলার ইউনিয়ন বোর্ড বর্জন ও চৌকিদারি ট্যাক্স বাতিল আন্দোলনেও জেলার বহু মানুষ এগিয়ে আসেন।

বাঁকুড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে এই জেলার নানা প্রান্তে গড়ে ওঠা কয়েকটি আশ্রমের কথা। গঙ্গাজলঘাটির কাছে গড়ে ওঠা অমর কানন আশ্রম, বৃন্দাবনপুরে মুক্তি আশ্রম, শুশুনিয়া পাহাড়ের অদূরে চাঁদড়ায় গড়ে ওঠা কল্যাণ আশ্রম মুক্তি সংগ্রামে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। অমর কানন আশ্রমের প্রাণপুরুষ গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ ছিলেন আজীবন গান্ধীবাদী স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মহাত্মা গান্ধী অমর কানন আশ্রমে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট কবি কাজি নজরুল ইসলাম। গান্ধীজীর আগমনে জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে নতুন উন্মাদনা এসেছিল।

শুধু গান্ধীজীই নন, স্বাধীনতা আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত করতে এ জেলায় ১৯২১-এ এসেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, ১৯২২-এ এসেছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সুভাষ চন্দ্র বসু এসেছেন ১৯২৯ ও ১৯৩৮-এ এবং পরে ফরোওয়ার্ড ব্লকের নেতা হিসেবে ১৯৪০-এর এপ্রিল মাসে। এ সময় তিনি বহু জায়গায় সভা করেছিলেন। ১৯৩৭-এ জেলায় হিন্দু মহাসভা নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪০-এ জেলার বিশিষ্ট বাগ্মী তরুণ রাখহরি চট্টোপাধ্যায় হিন্দু মহাসভায় যোগদান করলে স্বাধীনতা সংগ্রামে জেলায় এই সংগঠনটির জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে। বহু মানুষ হিন্দু মহাসভার আদর্শেও উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৩

১৯৫৬-র আগে আজকের পুরুলিয়া জেলা তৎকালীন বিহার প্রদেশে মানভূম জেলা হিসেবে যুক্ত ছিল। মানভূম তখন পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা। যোগাযোগের পথঘাটও প্রস্তরময়। মাহাত-কুড়মী সম্প্রদায়ের মানুষ ছাড়াও এ জেলায়

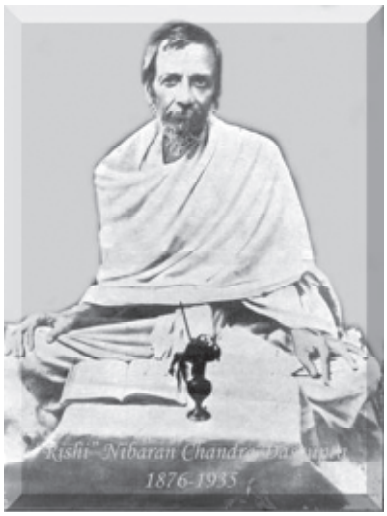

নিবারণ চন্দ্র দাসগুপ্ত

সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি জনজাতির মানুষ, কৃষিকাজে দক্ষ কুইরি, তেলি, ব্যবসায়ী তাম্বুলি, কিছু ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। এ জেলা শিক্ষা ও সাক্ষরতায় তখন অনেকটাই পিছিয়ে। তবে পুরনো শহর মানবাজার, পুরুলিয়ার মানুষ সচেতন। এ জেলার স্বাধীনতার সংগ্রামে যিনি অগ্নি সংযোগ করেছিলেন তিনি নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত (১৮৬৭-১৯৩৫)। তাঁর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার গাউপাড়া গ্রামে। পড়াশোনা বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজে। ১৯০০ খ্রিঃ তিনি বিএ পাশ করেন এবং স্কুলের সহকারী পরিদর্শকের চাকরি নিয়ে মেদিনীপুরে যান। ১৯১১ খ্রিঃ তিনি মানভূমে বদলি হয়ে আসেন। ১৯১৬ খ্রিঃ তিনি পুরুলিয়া জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৯২১ খ্রিঃ গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তিনি সরকারি স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর থেকে পুরো সময়ের জন্য দেশের মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, লোক-আকর্ষণী ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। আর ছিল তাঁর ঋষিতুল্য অনাড়ম্বর জীবনযাপন। এই জন্যই মানভূমবাসীর কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ঋষি নিবারণ চন্দ্র। দুর্বল শরীর আর খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যেও সারা মানভূমের নানা প্রান্তে তিনি ঘুরতে থাকেন। দেশের মুক্তি সাধনার আকাঙ্ক্ষাকে একটি আদর্শের ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তিনি। এজন্য পুরুলিয়া শহরের তেলকল পাড়ায় গড়ে তোলেন একটি রাজনৈতিক কার্যালয়, নাম দিলেন 'শিল্পাশ্রম'। পুরুলিয়ার বিশিষ্ট দানবীর হরিপদ দাঁ এই আশ্রমের জন্য জমি দান করেছিলেন। মানভূমের বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে

সিধো

যুক্ত হন এবং মানভূমের স্বাধীনতা সংগ্রাম এরপর একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ লাভ করে।

ইতিমধ্যেই ১৯২৫-এ বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দ্বাদশ অধিবেশন বসে পুরুলিয়া শহরে। এই উপলক্ষ্যেই মহাত্মা গান্ধী পুরুলিয়ায় এসেছিলেন। এ সময় বেশ কয়েকদিন পুরুলিয়ায় থেকে তিনি তৈরি করে দিয়ে যান মানভূমের আন্দোলনের মাটি। এই অধিবেশনেই গড়ে ওঠে কংগ্রেসের মানভূম জেলা কমিটি। কমিটির সভাপতি হন নিবারণ চন্দ্র, সম্পাদক হন বর্ধমান থেকে এসে পুরুলিয়া শহরে বসবাস করা বিশিষ্ট উকিল অতুল চন্দ্র ঘোষ (১৮৮১-১৯৬১)। নিবারণচন্দ্র-অতুলচন্দ্র জুটি এরপর সারা মানভূম জেলায় মুক্তি সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তোলেন। নিবারণচন্দ্র তাঁর স্বাধীনতার বার্তাটিকে জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে ১৯২৫ খ্রিঃ ২১ ডিসেম্বর থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। সাপ্তাহিক এই পত্রিকার নাম দেন 'মুক্তি'। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের বার্তা জেলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সেদিন 'মুক্তি' বড়ো ভূমিকা নেয়। এছাড়াও তিনি এই পত্রিকার মাধ্যমে মুক্তি সাধনার আদর্শকে যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রায়ই পুরুলিয়ার যাতায়াত ছিল। শহরে থাকার জন্য এক সাহেবের কুঠি বাড়ি তিনি কিনে নিয়েছিলেন। দেশবন্ধুর প্রয়াণের পর তাঁর আদর্শেই সেদিনের বিহারে প্রকাশিত হয়েছে দুটি পত্রিকা। ১৯২৫-এর শেষ থেকে পুরুলিয়ায় 'মুক্তি' আর ১৯২৮ থেকে চাঁইবাসায় 'তরুণ শক্তি'। মানভূম জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে 'মুক্তি' পত্রিকার ভূমিকা অপরিসীম। ১৯২৭-এর ২২ অক্টোবর সুভাষচন্দ্র বসু পুরুলিয়ায় এসেছেন। দু' দিন ছিলেন তিনি। দেখা করেছিলেন দেশবন্ধুর পত্নী বাসন্তী দেবীর সঙ্গে।

কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আন্দোলনও পুরুলিয়ায় সক্রিয় ছিল। কৃষি বিভাগের কর্মী ফণীভূষণ দত্ত গোলকুণ্ডা গ্রামে তিরিশ বিঘা জমি নিয়ে গড়ে তোলেন একটি কৃষি ফার্ম। এই ফার্ম বিপ্লবী কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠেছিল। অন্নদা কুমার চক্রবর্তী রামচন্দ্রপুরে গড়ে তোলেন 'আর্য আশ্রম' (১৯১৮)। নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের পরামর্শে এই আশ্রম 'মানভূম কর্মী সংসদ'-এ রূপান্তরিত হয় (১৯২৮)। এ সময় আর একবার সুভাষচন্দ্র পুরুলিয়ায় আসেন। রঘুনাথপুরে জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন। পুরুলিয়া শহরে 'শ্রদ্ধানন্দ কর্ম মন্দির' নামের একটি রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। এটি ছিল ব্যায়ামাগার ও পাঠাগার। কিন্তু এখানেও গোপনে বিপ্লবী কাজকর্ম চলত।

১৯২৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ঝালদায় দিনের আলোয় খুন হন ঝালদার যুবক ও কংগ্রেস কর্মী সত্যকিঙ্কর দত্ত। ঝালদার রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাই রাজার লোকেরাই তাঁকে হত্যা করে বলে জানা যায়। তাঁর স্মরণে ঝালদার অদূরে এক নদীর ধারে বসতে থাকে সত্য মেলা। সে মেলা এখনো বসে। ১৯৩০ সালে সারা জেলাতেই জমায়েতের উপর ১৪৪ ধারা জারি হয়। একদল সত্যাগ্রহী এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে সমবেত হন মেলা প্রাঙ্গণে। পুলিশ গুলি চালায়। তাতে পাঁচজন সত্যাগ্রহী মৃত্যুবরণ করেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মাহাত সম্প্রদায়ের যুবক।

১৯৩৫ সালের ১৭ জুলাই দীর্ঘদিন জেল যন্ত্রণা ভোগ করার পর দুর্বল শরীরের মানুষ ঋষি নিবারণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তারপর মানভূমের কংগ্রেসের রাজনীতি মূলত অতুলচন্দ্র আর নিবারণ চন্দ্রের পুত্র বিভূতিভূষণ দাশগুপ্তের মাধ্যমে এগিয়ে যায়। সঙ্গ দেন অতুলচন্দ্রের সহধর্মিণী লাবণ্যপ্রভা দেবী এবং বিপ্লবী বীর রাঘব আচারিয়া।

১৯৩৯-এ কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষ চন্দ্র বসু গড়ে তোলেন ফরোয়ার্ড ব্লক। জন্মলগ্ন থেকেই এই নতুন দলের জন্য মানভূম বাসীর উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট। পুরুলিয়ার নানা জায়গায় তিনি সভা সমাবেশ করেছেন। গেছেন রঘুনাথপুর, হুড়া, পাড়া, কাশীপুর ও রামচন্দ্রপুরে। বিয়াল্লিশের সত্যাগ্রহ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে মানভূমের মানুষ দলে দলে এগিয়ে আসেন। সহ্য করেন অপরিসীম পুলিশি নির্যাতন। জেলার জেলখানাগুলো ভরে উঠতে থাকে। পিকেটিং শুরু হয় মদের দোকানের সামনে। পুরুলিয়ায় 'শিল্পাশ্রম' ঘিরে ফেলে পুলিশ। নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর প্রতিবাদে নানা জায়গায় চলতে থাকে পিকেটিং ও হরতাল। স্বাধীনতার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরুলিয়া। মানবাজারে কয়েকশো সত্যাগ্রহী থানা আক্রমণ করতে আসে। ভয় পেয়ে পুলিশ গুলি চালায়। মৃত্যুবরণ করেন চুনারাম মাহাত, গোবিন্দ মাহাত, গিরীশ মাহাত প্রমুখ সত্যাগ্রহী কংগ্রেস কর্মী। এই সময় বান্দোয়ানের দুর্গম এলাকায় আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ করেন বিশিষ্ট দেশপ্রেমী ভজহরি মাহাত ও কুশধ্বজ মাহাত।

এমনি ভাবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার ছোট বড় গ্রাম, মফস্বলে সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনায় সংগঠিত হয়েছে স্বাধীনতার সংগ্রাম। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মূল ধারায় এইসব অকুতোভয় দেশপ্রাণ মানুষেরা অগোচরেই আছেন। আজ স্বাধীনতা ৭৫ বছরের মহতী উৎসবে এইসব মহৎ প্রাণদের উদ্দেশে আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি রইল।

অজ্ঞাত

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

কানপুরের গণিকা আজিজুন বাঈ

পতিতার কপর্দকহীন জীবনে দেশপ্রেমের ঋজুতা

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

শ্রীকান্ত উপন্যাসে রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে স্রষ্টা বলছেন ''যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া। ইহাতে তোমারই-বা কি লাভ? সংসারই-বা পাইল কি?''

সত্যিই তো যারা রোজ পচা শামুকে পা কাটে সেই দেহোপজীবিনীদের থেকে কী পায় সংসার? নাকি জনপদবধূদের স্বীকৃতি দিতে ভদ্রলোকদের কষ্ট। কষ্ট বলেই বাঙ্গলা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের নীরব অবদান নিঃশব্দে ক্যাটক্যাটে স্নো পাউডারের নীচে চাপা। মনোরঞ্জকের নাম অজানা থাকে....তাই অনেক ক্ষেত্রেই 'ওদের' 'তাদের' এসবে নিবন্ধের লজ্জা নিবারণ করতেই হচ্ছে। কলকাতার ইতিহাসে 'বাবু'দের নামের তালিকা পাওয়া যায় এবং তাদের মনোরঞ্জনের পর ওই যে 'ওরা' স্বদেশীদের থাকতে দিত, বিপ্লবীদের সাহায্য করত তার খতিয়ান ছাতা ধরা অস্টিন গাড়ির গদিতে লেপ্টে আছে। উপ-স্ত্রীর নাম অজানা থাকে জানতাম কিন্তু আর্কাইভ দেখতে দেখতে বুঝতে পারছি ওদের 'উপ-সংগ্রামী' করেই রাখা হয়েছে। সময় ধরে ধরে একটু দেখি ঠাসবুনোট গনিকার অজানা গল্প। ১৯০৭ সালে অনুশীলন সমিতির বিপ্লবী যুবকদের সাহায্যে যদি প্রথম কেউ এগিয়ে আসে তবে তা কলকাতার বারবণিতারা। ওই বছর বিডন স্কোয়ারে যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন তখন পুলিশ আচমকা লাঠি চার্জ করলে বিপ্লবীদের রক্ষা করে সেই নষ্টমেয়েগুলো। চিৎপুরের বাড়ির ছাদ থেকে ইটবৃষ্টি করলে পুলিশ তখনকার মতো পালায়। ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি সোনাগাছিতে একাধিক বৈঠক করেন। তারা রাতের স্যাঁতসেঁতে উপার্জন সেদিন দেশবন্ধুর হাতে তুলে দেন। তৈরি হয় 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' এবং তাতে অর্থ সাহায্যের জন্য 'পতিতা সমিতি' গড়ে ওঠে। মনাদা দেবীর কিছু লেখালিখি থেকে জানা যায় সেই গণিকাদের দল পথে পথে অর্থ সংগ্রহ করত মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে। সেই সংগৃহীত অর্থ তারা দান করেছিলেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে। বসুমতি পত্রিকা অবশ্য এ নিয়ে একটাই নিবন্ধ লিখেছিল। বরিশালেও গান্ধীবাদী শরৎকুমার ঘোষ একইভাবে পতিতা সমিতি গঠন করেন। ১৯২৪ সালে বারবণিতারা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বরের সত্যাগ্রহে অংশ নেন। অনুতাপের কথা এ নিয়ে প্রবাসী পত্রিকা নিন্দা করে। ১৯৩০-এ মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সত্যবতীর নাম আবছা হলেও পাওয়া যায়। হ্যাঁ তিনিও 'ওই' মেয়েগুলোর একজন। লবণ সত্যাগ্রহে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।

কোঠেওয়ালির সতীত্ব পরীক্ষা না করলে হয়? তাদের অবদান, কাজ মনের বিকাশ তাদের সতী বানিয়েছে। ১৮৫৬-তে বড়লাট ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমে অওয়াধ দখল করলে হজরত মহল মাত্র ১২ বছরের সন্তানকে নিয়ে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে অংশ নেন। তিনি রানি ভিক্টোরিয়ার শর্ত মানতে নারাজ। সেদিন এক কোঠেওয়ালির ঘুঙুরে নয়; বুকের পাটায় তার চারদিকে দল বেঁধে এসেছিলেন সরফাদদৌলা, মহারাজ বালকৃষ্ণ, রাজা জয়লাল, মাম্মু খান, বাইওয়ারার রানা বেনীমাধো বকশ, মহোনার রাজা দিগবিজয় সিং, ফৈজাবাদের মৌলবি আহমান উল্লাহ শাহ, রাজা মান সিংহ রাজা জাইলাল সিংহ। হজরত মহল ইংরেজদের দেওয়া পেনশন ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। বার বার তাঁকে হামলা করার ছক করা হয়। হেনরি লরেন্স ওই 'সাধারণ মেয়ে'র কাছে গেরিলা যুদ্ধে পরাজিত হন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো সেনাদল ওই কোঠা থেকেই বেরিয়েছিল। ইংরেজরা তাকে বাদশার বেদখল করা সম্পত্তি ফেরত পর্যন্ত দিতে চাইলে তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যাত হয়। ইউলিয়াম হাওয়ার্ড রাসেল 'মাই ইন্ডিয়ান মিউটিনি ডাইরি'-তে সব ডকুমেন্টস রেখেছেন। কানপুরের গণিকা আজিজুন বাঈ, ৪ঠা জুন ১৮৫৭, নানাসাহেব দামামা বাজালে সেই নাচলেওয়ালী সেদিন পুরুষের পোশাকে যুদ্ধ করেন। আজিজুন তার কোঠাতে সৈন্যদের শুশ্রূষা করতেন। রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর 'অন দ্য সিটি ওয়াল'-এ অনেক কান্নাভেজা গল্প আছে। নগরের নটী সেদিন যে দেহোপজীবিনীর পেশার আড়ালে এমন সাধনা করেছেন যা ভদ্রলোক আর নষ্ট মেয়ের সীমারেখার ঔদ্ধত্য মুছে দিয়েছে। মুজফ্ফরনগরের একঝাঁক এমন পুণ্য নষ্টের নাম পাওয়া যায়—আশা, বখতাভারি, হাবিবা, ভগবতী ত্যাগী, ইন্দর কৌর, জামিলা খান, মন কৌর, রহিমী, উমদা। দেশের বিপ্লবে অংশগ্রহণের ফলে এদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। গণিকারা সংগ্রামে অংশ নিলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতো। তারা বেশিরভাগই নিরক্ষর। তবুও সব চিরাচরিত চিন্তার মূলে, দেহ এক্সপ্লয়টেশনের ভিত্তিতে তারা সাড়া দেন। এদের ডকুমেনটেশান ঠিকভাবে হয়নি। দেশের জন্য গণিকাদের এই নিঃশব্দ আত্মনিবেদন ছাপ ফেলল কল্লোল সাহিত্যে। ফেলেনি? তবে প্রেমেন্দ্র মিত্রর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' কী? নিরাবেগ কিন্তু কোথাও যেন নিঃশব্দে বৃদ্ধি পেয়েছে নষ্টমেয়ে থেকে মেয়ে হয়ে ওঠার অধিকার। যারা সৃষ্টির প্রতি অভিশাপ নিয়ে রোজ বাঁচে তাদেরও বাঁচার সঞ্জীবনী এবং অনেক বড়ো কিছু দেওয়ার মধ্যে তারা যে ঘৃণ্যতার আয়তন কমাতে সক্ষম তা প্রতিষ্ঠিত। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

দুকড়িবালা রানি চন্দ

অসহযোগ আন্দোলনের

প্রথম সারির মহিলা যোদ্ধা

১৯৪২-এর অসহযোগ আন্দোলনে বোলপুরের রানি চন্দের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আদপে মেদিনীপুরের মেয়ে রানির কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল বীরভূম। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে রানির উল্লেযোগ্য ভূমিকা ছিল। ১৯৪২ সালে বোলপুরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাঢ়বঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেকটাই সংগঠিত হয়েছিল। প্রতিবাদে দুবরাজপুর মুনসেফ আদালত ভাঙচুর করেন বিপ্লবীরা। এই কর্মসূচিতে শামিল হন মেয়েরাও। পুলিশ রানি চন্দ-সহ অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। রানি চন্দের কারাবাসের সময়ের ছবি বর্ণিত হয়েছে তাঁর 'জেনানা ফাটক' বইটিতে।

বোলপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী পঙ্কজিনী রায়ের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। মহিলা সংগঠন তৈরিতে তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। পরবর্তীতে বোলপুর পুরসভার প্রথম মহিলা কমিশনার হয়েছিলেন পঙ্কজিনী। রাজগ্রামের আমোদিনী দাস, বোলপুরের স্মৃতিকণা বসু, ময়ূরেশ্বরের অলোকা পাল, পাইকরের গুরুভাবিনী দেবী, দুবরাজপুরের সরোজিনী নায়েক, আমোদপুরের সিন্ধুবালা দত্ত, ভালাসের সাবিত্রী গুপ্ত, হরিভাবিনী গুপ্ত, বীণাপানি ঘোষ, সাঁইথিয়ার গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অগণিত নাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বীরভূমের দুকড়িবালা চক্রবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসামান্য অবদানের নিরিখে বিপ্লবীদের 'মাসিমা' হয়ে উঠেছিলেন। ১৯১৪ সালের আগস্টে রডা কোম্পানির ৫০টি মাউজার পিস্তল এবং ১২০০০ কার্তুজ বিপ্লবীরা সুকৌশলে সরিয়ে নেন। ১৯১৭ সালের ৮ জানুয়ারি পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ৭টি পিস্তল ও কার্তুজ বাজেয়াপ্ত করে দুকড়িবালা চক্রবর্তীর শ্বশুরবাড়ি নলহাটির ঝাউপাড়া থেকে। দুকড়িবালার বাপের বাড়িও ছিল ওই ঝাউপাড়া গ্রামেই। তল্লাশির খবর পেয়ে পিস্তল ও কার্তুজ সুরধনী মোল্লানির বাড়িতে সরিয়ে দিয়েছিলেন দুকড়িবালা। সে খবরও পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে। যথারীতি সেসব আটক করে পুলিশ। দুকড়িবালার বোনপো নিবারণ ঘটক এই পিস্তল ও কার্তুজ রাখতে দিয়েছিলেন তাঁকে। নিবারণ হুগলি মহসীন কলেজে পড়তেন। সেখানে তিনি 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু সময় বহু বিপ্লবী ঠাঁই নিয়েছেন এই 'মাসিমার' কাছে। এই ঘটনার পরে দুকড়িবালা ও নিবারণের নামে পুলিশ মামলা রুজু করে। সিউড়িতে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে মামলা ওঠে। বিচারে দুকড়িবালার এক বছরের কারাদণ্ড হয়। হাজত বাসের সময় তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার করে ব্রিটিশ পুলিশ। স্বাধীনতার লড়াইয়ে দুকড়িবালাই ছিলেন অস্ত্র আইনে ধৃত প্রথম মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামী। □

With Best Compliments From -

ORBIT PROJECTS
PVT. LTD.

1, Garstin Place
Kolkata - 700 001

DAYAL INDUSTRIES

DAYAL GROUP

MAKER OF INDUSTRIAL BLADES

Works
GOPALPUR HOUSE P.O. : R. GOPALPUR
GOPALPUR, 24 PARGANAS (North), PIN-700 136

Office :
3, Synagogue Street,
Room No. 12, 2nd Floor, Kolkata 700 001
PHONE : 22424296/22434571, 033-22421761

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

উত্তরবঙ্গের মহীয়সী অগ্নিকনা

দেবী চৌধুরানি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙ্গলা জুড়ে। বাঙ্গলার গ্রামগুলোকে যখন ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রাস করেছে সেই সময়ে এক মহীয়সী অগ্নিকন্যার সুযোগ্য নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় বাঙ্গলার বুকে। তিনি দেবী চৌধুরানি। ইতিহাসে কোনো উল্লেখ না থাকলেও, জনশ্রুতি ইঙ্গিত দেয় যে দেবী চৌধুরানি ছিলেন অধুনা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি-কোচবিহার অঞ্চলের মানুষ। তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দিরও রয়েছে জলপাইগুড়িতে। মন্দিরে এখনও পূজিত হন দেবী চৌধুরানি এবং ভবানী পাঠক। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন ভবানী পাঠক।

১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দের এক বিকেলে ঢাকায় ইংরেজদের কাছে অভিযোগ এল যে, ভবানী পাঠক নামে এক সন্ন্যাসী তাদের নৌকা লুঠ করেছে। ইংরেজরা ভবানী পাঠককে গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁকে বন্দি করা সহজ ছিল না। গোরা সাহেবদের এদেশের শাসক বলে মানতেন না ভবানী। দেবী চৌধুরানির নেতৃত্বে তিনি ইংরেজদের ওপর হামলা চালান। তার ফলে ময়মনসিংহ ও বগুড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা ক্রমশ অচল হয়ে পড়ে।

এবার কড়া হল ইংরেজ সরকার বাহাদুর। লেফটেন্যান্ট ব্রেনের নেতৃত্বে বিশাল ইংরেজবাহিনী হাজির হল ময়মনসিংহে। ভীষণ জলযুদ্ধে পরাজিত হলেন ভবানী পাঠক। ইংরেজরা তাঁকে হত্যা করে।

উত্তরবঙ্গের কৃপানাথ নামে একজন সন্ন্যাসী মঠাধ্যক্ষ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। বাইশ জন সহকারী সেনাপতি-সহ তিনি দুপুরে ইংরেজবাহিনী দ্বারা ঘেরাও হন। পরে ইংরেজদের জাল কেটে তিনি নেপাল ও ভুটান সীমান্তের একটি গ্রামে আশ্রয় নেন। উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অপর একজন নেতা ছিলেন দর্পদেব। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজবাহিনীর সঙ্গে তাঁর খণ্ডযুদ্ধ হয়।

কোচবিহারে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন রামানন্দ গোঁসাই। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে দিনহাটায় তার বাহিনীর সঙ্গে লেফটেন্যান্ট মরিসনের সংঘর্ষ বাধে। রামানন্দের বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র স্বল্প, ইংরেজদের থেকে নিকৃষ্টমানের। তাও অদম্য জেদ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তিনি গেরিলা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করে মরিসনের বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। ইংরেজবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

দাঙ্গা-কবলিত ভারতবাসীকে বাঁচিয়েছিলেন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাই

সুজিত রায়

"রাওয়ালপিন্ডির কিছু সাহসী মানুষ আজ আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আমি তাদের বলেছি, শান্ত থাকতে। ভগবান মহান। ভগবান সর্বত্র বিরাজ করছেন। তাঁর ধ্যান করুন। তাঁর নাম স্মরণ করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে। তাঁরা জানতে চেয়েছিলেন, পাকিস্তানে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের কী হবে। আমি তাঁদের পালটা প্রশ্ন করেছি, ওরা সবাই এখানে (দিল্লিতে) আসছেন কেন? ওঁরা কেন ওখানেই মৃত্যুবরণ করছেন না? আমি মনে করি, আমরা যেখানেই বাস করি, সেখানেই জমি আঁকড়ে পড়ে থাকা উচিত। তার জন্য যতই নিষ্ঠুর অত্যাচার হোক না কেন? সবার বোঝা উচিত, যাঁদের হত্যা করা হচ্ছে, তাঁরা একটা সুখকর সমাপ্তি পাচ্ছেন। সবার কপালে কি স্বর্গসুখ জোটে? আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সবার সমাপ্তি যেন এমন সুখকর হয়। আমি বলব, আপনারা শিখ ও হিন্দু উদ্বাস্তুদের বোঝান, শান্তচিত্তে তাঁদের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্য ছাড়াই নিজেদের বাসস্থানে ফিরে যেতে।" ১৯৪৭-এর মধ্য সেপ্টেম্বরে গান্ধীজীর এই বিস্ময়কর বিবেচনাপ্রসূত বিবৃতির ফল যখন পঞ্জাব, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিষময় পরিণতি নিয়ে, যখন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু একটু খাদ্য, একটু আশ্রয়ের দাবি ভুলে শুধু প্রাণের দায়ে দৌড়াচ্ছে ভারতবর্ষের দিকে নিকটজনের লাশের পাহাড় আর রক্তে পিচ্ছিল পথ পার হয়ে, তখন কিন্তু অদ্ভুত সাহস, ধৈর্য আর পরিশ্রমের সাক্ষর রেখে চলেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। চেষ্টা করছিলেন পশ্চিম ভারতের পঞ্জাবে, কাশ্মীরে, দিল্লিতে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানুষের পরিচয়কে মানুষের কাছে তুলে ধরতে। আজ এই প্রবন্ধে তাঁদের জন্য তেমনই কিছু ঘটনার কথা তুলে ধরব বিশেষ করে যাঁরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে প্রচার করেন, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোনও অবদানই নেই।

দেশের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজকে যখন ইংরেজ সরকার, কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট এই ত্রিমুখী শক্তির আক্রমণ ও মুসলিম লিগের মতো এক চরম হিংসাশ্রয়ী শক্তির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তখন সেই আপৎকালে রক্তাক্ত, ধর্ষিতা, অত্যাচারিত, লুণ্ঠিত, সর্বস্ব-হারানো হিন্দু জনগণের পাশে থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কাজ করেছিল পাঁচটি দিকে লক্ষ্য রেখে– (১) সেবা, (২) রক্ষা, (৩) উদ্ধার, (৪) নিরাপদ স্থানে আশ্রয় দেওয়া, (৫) প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সেবাকাজে নিযুক্ত স্বয়ংসেবকরা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ও ওষুধ নিয়ে। নগরে ও গ্রামে জেহাদিদের আক্রমণের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে অত্যাচারিতদের রক্ষা করেছিলেন স্বয়ংসেবকরা। অপহৃত নারীদের উদ্ধার করা, জেহাদি লিগ গুন্ডাদের নজর থেকে মেয়েদের উদ্ধার করা— এমনকী মুসলমান মেয়েদেরও নিরাপদ আশ্রয়দানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করেছিলেন স্বয়ংসেবকরা, অকুতোভয়ে শত্রুর মুখোমুখি লড়াই করে। একদল স্বয়ংসেবকের শুধু কাজই ছিল সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে নিয়ে বাসে, ট্রেনে, টাঙ্গায় চাপিয়ে কিংবা হাঁটাপথে নিরাপদ ছাদের নীচে আশ্রয় দেওয়া। আর সেই সঙ্গে স্বয়ংসেবকরা উদ্বাস্তুদের সাহস জুগিয়েছিলেন সংহত হতে, একে অপরের হাত ধরে প্রতিরোধী হয়ে উঠতে যাতে লিগ নামধারী পশুরা আর আক্রমণের সাহস না দেখায়।

তখন লাহোরে উদ্বাস্তু শিবিরে হিন্দু শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০০। টানা দু'মাস কোনওরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই দিনরাত পরিশ্রম করে শিবিরগুলিকে পরিচালনা করলেন ১০০০ স্বয়ংসেবক। শুধু লাহোরেই নয়, এই লাহোর থেকেই মানুষের বাঁচার রসদ পাঠানো হতো দিল্লি, মান্দা, গুজরখাঁন, গারিয়াল, বোওয়াল, ডেরা ইসমাইল খান, মুলতান ইত্যাদি অঞ্চলে গড়ে তোলা সঙ্ঘের শরণার্থী শিবিরগুলিতে। পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই—তখনও পঞ্জাবে দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন, চলছে নির্বিচারে লুঠ আর হত্যালীলা। তারই মধ্যে পিছপা না হয়েই সাহসের

সঙ্গে শিবিরগুলিতে হাজার হাজার বাসিন্দার পেটে সেদিন দুটো রুটি, দুমুঠো ভাত আর অপরিসীম ভালোবাসা বিতরণ করে স্বয়ংসেবকরা মানবসেবার একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল।

পাঠানকোট শিবির ছিল সবচেয়ে শৃঙ্খলাপরায়ণ ও ব্যবস্থিত শরণার্থী শিবির। বাতালা শিবিরে তখন ৭০০০ উদ্বাস্তু। গুরুদাসপুরে মাণ্ডি শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন ৪০০০ মানুষ। হাজারে হাজারে উদ্বাস্তু নিরাপত্তা পেতে আশ্রয় নিয়েছেন বাতালায়, মাধবপুরে, সুজনপুরে, ধারমাকালে। ডেরাবাবা নানক শিবিরে তখন ৫০,০০০ শরণার্থী। ফিরোজপুরের আনাজমাণ্ডি শরণার্থী শিবিরে ঠাঁই নিয়েছিলেন ৬০,০০০ শরণার্থী। শুধু জীবিত মানুষকে বাঁচাতেই নয়, মৃত মানুষের সৎকার ও আদ্যশ্রাদ্ধের কাজেও কোনও ফাঁক ছিল না । পাঠানকোটের শরণার্থী শিবির দেখতেন স্থানীয় সঙ্ঘচালক নিজেই। আর হোশিয়ারপুরে দায়িত্ব নিয়েছিলেন জেলা প্রচারক কৈলাশনাথজী। সঙ্গী ছিলেন সমাজসেবী পণ্ডিত দুর্গাদাস, তরুণ স্বয়ংসেবক মনোহরলাল সুদ। কোনও দাক্ষিণ্য নয়, সঙ্ঘ চেয়েছিল শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে যাঁরা সেদিন সর্বহারা, তাদের পাশে দাঁড়াতে। হাতে হাত ছোঁয়াতে। একাশি বছর বয়সের ভার উপেক্ষা করে পণ্ডিত দুর্গাদাস কর্মশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন।

সঙ্ঘ সম্পর্কে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের দুর্মুখ চরিত্রগুলো যে কথাই প্রচার করুক না কেন, মূল সত্যটা ছিল সঙ্ঘের ভিত যার অন্যতম উপাদান ছিল জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস। লাহোর থেকে পলায়নের পর হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে ছিল বিপুল পরিমাণ সোনার গহনা। তাঁরা পথের বিপদ অনুধাবন করে, লিগের দুর্জন চরিত্রগুলির লুটেরার ভূমিকার কথা মাথায় রেখে নির্দ্বিধায় সেই শ' শ' ভরি সোনার গয়না উদ্বাস্তুরা রেখে যেতেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অফিসে, পাঞ্জাব রিলিফ কমিটির অফিসে। বলে যেতেন, 'ফিরে যদি আসি, তখন না হয় ফেরত নেব।'

সঙ্ঘের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, আতঙ্কিত মানুষ যেন দেশ ছেড়ে না পালায়। তাদের পাশে থাকতে হবে। সাহস জোগাতে হবে। ঠিক এইভাবেই লাহোরের সুপরিচিত হিন্দু নেতা ভাই পরমানন্দ এবং তাঁর ছেলে ভাই মহাবীর হিন্দু পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ধরমবীর ও তাঁর পরিবারকে লাহোর ছেড়ে যেতে দেননি।

অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, লুটেরা লিগ গুন্ডাদের হাত থেকে হিন্দু মহিলাদের উদ্ধার করা। এরকম একটি ঘটনা ছিল গুজারানওয়ালার এক লিগপন্থী তেল বিক্রেতার বাড়ি থেকে লুণ্ঠিত এক অতিশিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কন্যার উদ্ধার কাহিনি। স্থানীয় শাখা কার্যবাহ চুনীলাল কাপুর খবর পেয়েছিলেন, এক মুসলিম তেল বিক্রেতা মেয়েটিকে জোর করে তার বাড়িতে আটকে রেখেছে। স্বয়ংসেবকরা ওই বাড়ি ঘেরাও করে যখন মেয়েটির কাছে পৌঁছতে পারলেন, তখন মেয়েটি সর্বস্বান্ত। তার মা-বাবাকে খুন করা হয়েছে ছোরার আঘাতে। তার স্বামীর মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে। ছোট বোনকে ছিনতাই করা হয়েছে। আর মেয়েটিকে একের পর এক পুরুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছে গণধর্ষণের খেলনা হিসেবে। মেয়েটিকে উদ্ধার করে স্বয়ংসেবকরা তুলে দিলেন লাহোরের এক নির্ভীক দয়াময়ী চিকিৎসক ডাঃ রাধার হাতে। ডাঃ রাধা তার চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখে অবাক হয়েছিলেন, মেয়েটির কপালে গরম ছেঁকা দিয়ে 'আকবর' লেখা হয়েছে। তার দুই স্তনে আঁকা হয়েছে চাঁদ ও তারা। তবুও ডাঃ রাধার তত্ত্বাবধানে মেয়েটি সুস্থ জীবন ফিরে পেয়ে সমাজের মূলস্রোতে সেবাব্রতীর ভূমিকা নিয়েছিলেন।

With Best Compliments from : -

INDER NAHATA (P) LTD.

Rang Rez Sarees

Manufacturer of Sarees & Kurti

45/1, Rafi Ahmed Kidwai Road

(Near Park Street Police Station)

2nd floor, Kolkata - 700 016

PHONE : 2265-9147, 94330-15473

JALAN JAN KALYAN TRUST

Flat No. 1A, Paramount Apartments

25, Ballygunge Circular Road

Kolkata - 700 019, TEL : 2475-6524, 2475-7760

Fax : 2475-7619, E. mail : madhuban@salyam.net.in

সঙ্ঘের সেবাব্রতী ভূমিকার এমনই আর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ এক পরিজন ও সর্বস্ব হারানো উদ্বাস্তু যুবককে নতুন জীবন দান। চুনীলাল কাপুরের নেতৃত্বেই লাহোরের এক শরণার্থী শিবিরে ছেলেটিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন চুনীলাল। পরে ওই শিবিরেই আশ্রয় নেওয়া একটি সদ্য উদ্ধার হওয়া তরুণীর সঙ্গে ওই যুবকের বিয়ে দিয়েছিলেন চুনীলাল। পরে ওই নব দম্পতি তাদের সুখী দাম্পত্য জীবন সমাজের মূলস্রোতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

সিন্ধুপ্রদেশের স্বয়ংসেবকরা কাজ করতেন আরও ঝুঁকি নিয়ে। তাঁরা লিগপন্থীদের মতো পোশাক পরে মহিলাদের বোরখা পরিয়ে সঙ্গী বেগম সাজিয়ে ভারত সীমান্ত পার করিয়ে দিতেন।

বর্তমানে মুম্বাই নিবাসী বিজয়কুমার তেজোয়ানির বাড়ি ছিল করাচীতে। ১৯৪৭-এর ডিসেম্বরে তাঁকে লিগগুন্ডারা হুমকি দিল—চার ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে, নয়তো মৃত্যু নিশ্চিত। অসহায় পরিবারটির পাশে ছুটে গেলেন স্বয়ংসেবকরা। স্বয়ংসেবকরাই গোটা পরিবারকে করাচী বন্দরে পৌঁছে দিলেন এবং টিকিট কেটে জাহাজে তুলে দিলেন যাতে তাঁরা নিরাপদে বোম্বাই পৌঁছতে পারে। তেজোয়ানি পরিবার সেদিন বারবার জানতে চেয়েও স্বয়ংসেবকদের নাম জানতে পারেননি। এমনকী তাদের হাতে কিছু টাকা পয়সা দিতে চাইলেও তাঁরা তা নেননি।

কিন্তু এসব কাজ করতে গিয়ে বিপদের মুখোমুখি কম হতে হয়নি স্বয়ংসেবকদের। যেমন বিচারপতি তেজা সিং। তিনি সীমান্ত প্রদেশের কাহুটার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই স্থানীয় গুরুদ্বারা দুর্গ হয়ে উঠেছিল হিন্দু ও শিখদের যৌথ উদ্যোগে। ওই গুরুদ্বারা হয়ে উঠেছিল হিন্দু ও শিখদের আত্মরক্ষার কবচ। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি তাঁরা । লিগপন্থীরা গুরুদ্বারের বাইরে এসে কোরান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করল—'আমরা কথা দিচ্ছি, আপনারা বাইরে এসে নিজের নিজের বাড়ি ফিরে যান। কারও কোনও ক্ষতি হবে না। সে কথায় বিশ্বাস করে গুরুদ্বারের দরজা খোলামাত্র কালান্তক আক্রমণ নেমে এল। নৃশংসভাবে খুন হলেন বহু শিখ ও হিন্দু।

ঠিক একইভাবে স্বয়ংসেবকরা খুন হয়েছিলেন লাহোরে ডাঃ হরবনস লালের নেতৃত্বে রাভী রোড এলাকার হিন্দুদের রক্ষা করতে গিয়ে। ওই এলাকা ঘিরে ধরেছিল লিগপন্থী গুন্ডারা। একটি ট্রাকে চেপে যাবার সময় পথিমধ্যে বালুচ রেজিমেন্টের সৈন্যরা তাদের ওপর গুলি চালায়। কৌশল করে বেঁচে ফিরেছিলেন ডাঃ হরবনস লাল ও তাঁর দুই সঙ্গী। বাকিদের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল বালুচ সেনাদের বন্দুক। এমনকী নির্ভীক স্বয়ংসেবক প্রদুম্ন সিংহকেও, যিনি একদা একাই তিন লিগ গুন্ডার মাথা কেটে নিয়েছিলেন তরবারির কোপে।

দেশভাগ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ে এমন অজস্র ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে যা প্রমাণ করে উদ্বাস্তুদের প্রাণরক্ষায় কংগ্রেস কিংবা কমিউনিস্টদের ভূমিকার চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা যখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে বৈদেশিক শক্তির পোষ্যর ভূমিকা পালন করে গেছে, সঙ্ঘের নেতৃত্ব এবং স্বয়ংসেবকরা তখন ভারতমাতার প্রকৃত সন্তানের ভূমিকা পালন করেছে আর্তের পাশে দাঁড়িয়ে। নিরাপরাধ অত্যাচারিতদের কাঁধে হাত রেখে। লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা নারীর চোখের জল মুছে তাঁদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছিলেন স্বয়ংসেবকেরা। □

নোয়াখালীর দাঙ্গা

১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালী ও টিপ্পেরা জেলায় ঘটা গণহত্যা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসে'র পরবর্তী একটি কলঙ্কিত

ঘটনা হিসেবে পরিচিত। কলকাতা দাঙ্গার খবর নোয়াখালী-টিপ্পার দাঙ্গাকে প্রভাবিত করেছিল। তবে হিংস্রতা কলকাতা দাঙ্গার চেয়ে প্রকৃতিতে আলাদা ছিল।

উত্তর নোয়াখালী জেলার রায়গঞ্জ থানার অধীনে থাকা অঞ্চলগুলোতে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর গণহত্যা শুরু হয়। এই গণহত্যাকে 'মুসলিম উচ্ছৃঙ্খল জনতার সংগঠিত ক্রোধ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের ঢেউ শীঘ্রই প্রতিবেশী রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালীর সন্দ্বীপ ও ত্রিপুরা জেলার ফরিদগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম এবং চৌদ্দগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। তবে সরকারি মতে, এই হত্যাকাণ্ডে ২০০-৩০০ জন মারা যায়। নোয়াখালীতে দাঙ্গা বন্ধ হওয়ার পরে মুসলিম লিগ দাবি করেছিল যে কেবল ৫০০ হিন্দু মারা গিয়েছিল, কিন্তু বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা মনে করেন যে ৫০,০০০-এরও বেশি হিন্দু নিহত হয়েছিল।

বিহার এবং ভারতের অন্যান্য অংশে

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়। কলকাতার গণহত্যা ও নোয়াখালী গণহত্যার পর ৩০ অক্টোবর ও ৭ নভেম্বরের মধ্যে ঘটা এই দাঙ্গার ফলে মুসলিম লিগ দেশভাগের দাবি তোলে। ২৫-২৮ অক্টোবরের মধ্যে ছাপড়া ও সরণ জেলায় মারাত্মক সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। খুব শীঘ্রই পাটনা, মুঙ্গের এবং ভাগলপুর মারাত্মক সহিংসতার জায়গায় পরিণত হয়েছিল। নোয়াখালী দাঙ্গার প্রতিশোধ হিসাবে শুরু হওয়া এই দাঙ্গা বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সংসদে গৃহীত বিবৃতি অনুসারে, মৃতের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকা অনুযায়ী, মৃতের সংখ্যা ছিল ৭৫০০ থেকে ১০,০০০ জন এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মৃতের সংখ্যা বলা হয় ২০০০ জন। তবে জিন্না এই সংখ্যা ৩০,০০০ বলে দাবি করেন। তবে, ৩ নভেম্বরের সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা ৪৪৫ জন বলা হয়।

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

স্বয়ংসেবকরা সচেতন না থাকলে সেদিন পাকিস্তান ভারত দখল করত

সু. রা.

ভারতবর্ষের অনেকেরই, বিশেষ করে আজকের প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের জানা নেই যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার মাত্র ২৫ দিনের মাথায় পাকিস্তান সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে মুসলিম লিগ পন্থীরা ভারতের মন্ত্রীসভার সদস্য, সমস্ত হিন্দু প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি এবং হাজার হাজার হিন্দুকে খুন করে লালকেল্লায় পাকিস্তানের পতাকা তোলার পরিকল্পনা করেছিল। সেই পরিকল্পনা হয়তো সফলও হতো যদি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কয়েকজন সচেতন স্বয়ংসেবক খবরটি যথাসময়ে না পেতেন এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছে খবরটি পৌঁছে না দিতেন। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তাই না? মুসলিম লিগ আলাদা দেশ হিসেবে পাকিস্তান পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি তারা। তারা চেয়েছিল সম্পূর্ণ ভারত। পরিবর্তে ছোট্ট একটি অংশ ভিক্ষা নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হয়েছিল মুসলিম লিগকে। সেই শোক ভোলা শক্ত ছিল বই কী। আর সেজন্যই 'ক্যু'-এর পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটি ছিল সুদূরপ্রসারী। কারণ রাতারাতি একটা গোটা দেশ দখলের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে জড়ো করা হয়েছিল স্তূপীকৃত বোমা, বিস্ফোরক, অস্ত্রশস্ত্র, স্টেনগান, মর্টার, ব্রেনগান। এসব প্রস্তুত করার জন্য তৈরি হয়েছিল অনেকগুলি ছোটোছোটো ফ্যাক্টরি। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে. বি. কৃপালনী প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছিলেন, মুসলমানদের বাড়িগুলি রীতিমতো অস্ত্রাগার হয়ে উঠেছিল। 'কোনও কোনও জায়গায় এইসব অস্ত্র তীব্র সংঘর্ষের সময় ব্যবহৃতও হয়েছিল। ....এইসব দাঙ্গা বন্ধ করা সরকারের পক্ষে কষ্টকর হয়েছিল, কেননা পুলিশের একটা বড়ো অংশই ছিল মুসলমান। তাদের অনেকেই ইউনিফর্ম ও অস্ত্র নিয়ে পুলিশবাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বাকিদের আনুগত্যও প্রশ্নাতীত ছিল না। সরকারকে সৈন্য ও অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ বাহিনী আনতে হয়েছিল।'

ঘটনাটা হয়তো ধামাচাপাই পড়ে যেত যদি না বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কংগ্রেস নেতা তথা স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতরত্ন ডঃ ভগবান দাস ১৯৪৮-এর ১৯ অক্টোবর এই বিবৃতি না দিতেন—

''আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানি আর এস এসের কয়েকজন তরুণ কর্মী সর্দার প্যাটেল ও নেহেরুজীকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ লিগের পরিকল্পিত ক্যু সম্পর্কে একেবারে ঠিক সময়ে সংবাদ দিয়েছিলেন। লীগপন্থীরা সরকারের সকল সদস্য, হিন্দু অফিসার এবং হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করে লালকেল্লায় পাকিস্তানের পতাকা তোলার পরিকল্পনা করেছিল। এভাবেই ভারত দখলের ষড়যন্ত্র ছিল। .....

যদি সেই আত্মত্যাগী, উদ্বুদ্ধ তরুণরা সেদিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নেহরুজী ও প্যাটেলজীকে সংবাদ না দিতেন, তাহলে আজ 'ভারত সরকার'..... বলতে কোনও সরকার থাকতো না। সারা দেশের নামই হতো পাকিস্তান। অসংখ্য মানুষ নিহত হতো, বাকিরা হয় ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হতো, অথবা নগ্ন দাসত্বে নেমে যেত।" লজ্জার ব্যাপার, সেই সময়ে সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ এসব কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু সেদিন দেশকে বাঁচিয়েছিলেন স্বয়ংসেবকরাই।

তথ্যঋণ ঃ

আর এস এস কী ও কেন? অশোক দাশগুপ্ত।।

১৯৪৬-এর কলকাতা হত্যাকাণ্ড

এই হত্যাকাণ্ড 'কলকাতা দাঙ্গা' বা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস' নামেও পরিচিত। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তদানীন্তন ব্রিটিশ ভারতের বঙ্গ প্রদেশের রাজধানী কলকাতায় মুসলিম লিগের দ্বারা সংঘটিত একটি ভয়ংকর নরহত্যার ঘটনা ছিল এটি। এদিন জিন্না ভারতীয় মুসলিমদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' নামে দেশব্যাপী প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেন।

এই উত্তেজনার পটভূমিতে কলকাতায় এক ভয়ংকর হিন্দু হত্যা সংঘটিত হয়। মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে শহরে চার হাজারেরও বেশি সাধারণ মানুষ প্রাণ হারান এবং ১,০০,০০০ বাসিন্দা গৃহহারা হন।

মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবর্ষের মুসলমানদের ১৬ আগস্টকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' হিসেবে পালনের আহ্বান জানিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সূচনা হয় ১৬ আগস্ট সকাল থেকেই। সকাল দশটার আগেই লালবাজারের পুলিশ সদর দফতর জানিয়েছিল যে শহরজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে, দোকানপাট বন্ধ করতে বাধ্য করা হচ্ছে এবং পাথর ও ইটপাটকেল ছোঁড়াছুঁড়ি, ছুরিকাঘাতের খবর পাওয়া গেছে।

এদিন মেটিয়াব্রুজের লিচুবাগান এলাকার কেসোরাম কটন মিলসের প্রায় ৩০০ জন হিন্দু শ্রমিককে হত্যা করা হয়। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সময় বহু মানুষ কলকাতা ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে থাকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই অগণিত মানুষের ঢেউ ছিল হাওড়া স্টেশন অভিমুখে। তাদের অনেকেই কলকাতার বাইরের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া এই আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেননি। ব্রিটিশ এবং কংগ্রেস উভয়েই জিন্নাকে এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের জন্য দোষারোপ করেছিল এবং এই ধরনের মুসলিম মনোভাব জাগ্রত করার জন্য মুসলিম লিগকে দায়ী করা হয়েছিল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের এই দাঙ্গার সঠিক কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

সংবাদমাধ্যমগুলির মতে সোহরাওয়ার্দি সরকার এবং মুসলিম লিগই পুরো ঘটনার জন্য দায়ী। তাদের মতে, মুসলিম লিগের সদস্য এবং এদের অনুমোদিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' ঘোষণা কার্যকর করার জন্য মুসলিম জনগণকে উস্কানিমূলক বক্তৃতা দেয়। এবং তাদের স্বাধীন পাকিস্তানের দাবি সমর্থনের জন্য 'সমস্ত ব্যবসা স্থগিত' করার ডাক দেয়। দাঙ্গার ফলে হিন্দু, শিখ এবং মুসলমানদের মধ্যে আরও দাঙ্গা ও অসম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। □

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড

১১ নভেম্বর, ১৯৮১ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু ইংরেজ সরকারের নীতিতে কোনও রকম পরিবর্তন দেখা যায়নি। যেসব সৈন্য যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, এসময় তাদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক মন্দা এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ভারত জুড়ে। ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারিতে এক কোটিরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতবাসীর মনে ক্ষোভ এবং ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের সূচনা ঘটে। এসময় ইংরেজ সরকার একদিকে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার আইন করে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করে, একই সঙ্গে আবার রাওলাট আইন করে ইংরেজ সরকার বিরোধী সকল বিক্ষোভ কঠোর হাতে দমনের জন্য নির্যাতনমূলক আইন জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়। এই আইনের অধীনে বিনা কারণে গ্রেপ্তার, অন্তরীণ ও সংক্ষিপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণহীন বিচার ও বন্দিত্বের বেপরোয়া পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধী তখন অহিংস এবং সত্যাগ্রহ তথা রক্তপাতহীন আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করছেন। কর্মসূচীতে অংশ নিতে পঞ্জাব যাওয়ার পথে গান্ধীজীকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদে আহমেদাবাদের শিল্প শ্রমিক এবং পঞ্জাবের সাধারণ জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এর পরও বিক্ষোভ কমেনি। ধর্মঘট এবং বিক্ষোভের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সরকারি দপ্তর এবং যানবাহন। সাদা চামড়ার ইউরোপীয় কর্মকর্তা এবং অধিবাসীদের উপরও ভারতীয়রা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের ওপরও আক্রমণ করা হয়। এপ্রিলের ১৩ তারিখ দুজন রাজনৈতিক নেতাকে অমৃতসর থেকে গ্রেফতার করা হয়। এই পটভূমিতেই বলতে হয় হত্যাকাণ্ডের আবহ তৈরি হয়েছিল।

১৯১১ সালের ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের চারদিক ঘেরা উদ্যানে অজস্র মানুষ সমবেত হয়েছিলেন প্রতিবাদের জন্য। ডায়ারের নির্দেশে ১০০ জন গুর্খা সৈন্য আর ২টি সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ব্রিটিশবাহিনী প্রায় দু'হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। আর এতে খরচ হয়েছিল ১৬৫০ রাউন্ড গুলি। জালিয়ানওয়ালাবাগের মাঝখানে কুয়োতে পাথর ফেলে কিছু মানুষকে জীবন্ত রুদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের ভয়ানক ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ব্রিটিশ শাসনের নগ্ন রূপের প্রকাশ হয়ে পরে। ইংরেজ সরকার জেনারেল ডায়ারের কাজকে সমর্থন করে। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গোটা বিশ্ব শিহরিত হয়। দেশে-বিদেশে সর্বত্র সরকারের নগ্ন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র ঘৃণা ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দু' দিন পরে, ১৫ই এপ্রিল, গুজরানওয়ালায় বিক্ষোভ সংঘটিত হয় অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ ও বিমান ব্যবহার করা হয়, এর ফলে ১২ জন মারা যায় এবং ২৭ জন আহত হয়।

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

কর্ণগড়ের

রানি শিরোমণি

পশ্চিম মেদিনীপুর

ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার প্রথম রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। ১৭৬৭-তে পাইকান জমি বাতিল করায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় শুরু হলো চুয়াড় বিদ্রোহ। প্রথম বিদ্রোহী হলেন ঘাটশিলার ধলভূমের রাজা জগন্নাথ সিংহ। এরপর বাঁকুড়ার রাইপুরের দুর্জন সিংহ। অম্বিকানগর, সুপুর-সহ গোটা জঙ্গল মহল জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো বিদ্রোহের আগুন। বিদ্রোহ দমনে নেমে ইংরেজরা জঙ্গলমহলের বেশকিছু জনজাতি যোদ্ধাকে গাছের ডালে ফাঁসি দেয়। উদ্দেশ্য, বিদ্রোহীদের মধ্যে ভীতি তৈরি করা। কিন্তু প্রজারা ভয় না পেয়ে নতুন উদ্যমে শুরু করলো দ্বিতীয় চুয়াড় বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের পুরোভাগে ছিলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। তিনি তাঁর প্রজাদের নিয়ে তৈরি করলেন এক শক্তিশালী গেরিলা যোদ্ধাবাহিনী।

অধুনা পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বে কর্ণগড়ের অবস্থান। কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের দুই রানি—রানি ভবানী ও রানি শিরোমণি। অজিত সিংহ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। ১৭৬৫-তে মোগল সম্রাট শাহ আলমকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। অধিক রাজস্ব লাভের স্বার্থে এদেশের স্বাধীন জমিদারদের ওপর চাপলো বাড়তি খাজনার বোঝা। বাতিল করা হলো প্রজাদের জন্য নির্দিষ্ট নিষ্কর পাইকান জমি। এতদিন যে রাজকাজের বিনিময়ে পাইকান জমি ভোগ করে আসছিল জমিদারদের পাইক, বরকন্দাজ, লাঠিয়ালরা, সে জমি কেড়ে নিল ইংরেজরা।

১৭৬০-এ রানি ভবানীর মৃত্যুর পর ইংরেজরা তাঁর জমির অংশ কেড়ে নিল। রানি শিরোমণি তাঁর রাজকর্মচারী ত্রিলোচন খানের সহায়তায় জমিদারি চালাতে লাগলেন। তির-ধনুক, লাঠি, বর্শা, বল্লম, টাঙি, বাঁটুল-সহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্রে সেজে উঠলো তাঁর বীরবাহিনী। জঙ্গলমহলের পথঘাট তাদের নখদর্পণে। গেরিলা যুদ্ধে কাবু হয়ে ক্রমশ পিছু হঠতে লাগলো ইংরেজ বাহিনী। রানি শিরোমণি ঘোষণা করলেন, ইংরেজদের যে রসদ জোগাবে, তাদের দেওয়া হবে প্রাণদণ্ড।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল ইংরেজরা চুয়াড় বিদ্রোহের নেত্রী হিসেবে রানি শিরোমণির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলো। জঙ্গলমহলের বীর যোদ্ধাদের অনেকেই লাঠি-টাঙি-বল্লম- বর্শা-তির-ধনুক নিয়ে ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করলেন। কর্ণগড় দুর্গে অবরুদ্ধ রাণি সেখান থেকে গোপন সুড়ঙ্গ পথে মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে আবাসগড় দুর্গের দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু মাঝপথেই ধরা পড়তে হলো ইংরেজদের হাতে। তাঁকে নজরবন্দি করা হয় আবাসগড় দুর্গে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর। □

ফ: ৫

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

আশা সহায়

লক্ষ্মী সায়গল

নেতাজীর ঝাঁসি ব্রিগেড

প্রথম মহিলা রেজিমেন্ট

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের মহিলা নেত্রী হিসেবে ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের বীরত্বের কথা সবারই জানা। তাই নেতাজীও তাঁর নারী-বাহিনীর নাম রেখেছিলেন 'ঝাঁসির রানি বাহিনী'। সুভাষের বীরাঙ্গনা বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ওরফে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী সায়গল।

দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা লক্ষ্মী পেশায় ছিলেন চিকিৎসক ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। পরে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন তিনি। লক্ষ্মী সায়গলের কাজে মুগ্ধ হয়ে নেতাজী তাঁর হাতেই তুলে দেন ঝাঁসির রানি বাহিনী'র নেতৃত্ব।

ইউরোপ থেকে ফিরে ১৯৪৩ সালের ২ জুলাই নেতাজী সিঙ্গাপুরের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত শিহরণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন নারী বাহিনীর সবাই। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মীর ভাষায়, 'অ্যাজ ইফ চার্জড উইথ ইলেকট্রিসিটি।' শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে আস্ত একটি রেজিমেন্ট তৈরি করার কথা এর আগে কেউ ভাবেননি। কমব্যাট্যান্ট হিসেবে তাঁদের ট্রেনিং দেওয়ার কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারত না। সেই অকল্পনীয় ধারণাকেই বাস্তবে পরিণত করেন সুভাষ। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী একবার বলেছিলেন, 'আমার নামের (লক্ষ্মী) গুরুত্ব যে কতখানি প্রসারিত তা নেতাজীর সান্নিধ্যে না এলে হয়তো কখনও বুঝতেই পারতাম না। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে আমার নামটা জুড়ে দিয়ে নেতাজী যখন ঝাঁসি রেজিমেন্ট শুরু করলেন তখন উপলব্ধি করেছিলাম 'লক্ষ্মী' নামটার গুরুত্ব। এই নামটার সঙ্গেই বোধহয় মন্ত্রের মতো জড়িয়ে আছে লড়াইয়ের ইতিহাস'।

ঝাঁসি রেজিমেন্টে আরও যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরা হলেন কমান্ডার জানকী থেবার্স, লেফটেন্যান্ট আশা সহায় এবং অঞ্জলি ভৌমিক। ১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল শওকত আলি মালিকের নেতৃত্বে মণিপুরের মৈরাং ও ইম্ফলে প্রথম স্বাধীন ভারতের তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে আজাদ হিন্দ বাহিনী। সেদিন পরাক্রমী ব্রিটিশ পরাজিত হয়েছিল সাময়িকভাবে। কমান্ডার জানকী থেবার্স ঝাঁসি বাহিনীর ২৫০ জন বীরাঙ্গনা নিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন বিশেষ সুইসাইড স্কোয়াড। নেতাজী সেদিন রেডিয়ো মারফত ঘোষণা করেছিলেন, ''ঝাঁসি রানি বাহিনীর আমার সশস্ত্র বীরাঙ্গনা ভগিনীগণ... আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লি চলো স্লোগানের সঙ্গে আর একটি স্লোগান যুক্ত হোক—রক্ত, আরও রক্ত—ব্লাড, মোর ব্লাড। এর অর্থ ৪০ কোটি ভারতবাসীর মুক্তির জন্য আমাদের আরো নিঃশর্ত বলিদান।

লেফটেন্যান্ট আশা সহায় ও অঞ্জলি ভৌমিক যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে বীরগতি প্রাপ্ত হন। প্রায় ৫০০ নারী সৈন্য সম্মিলিত এই বিশাল মহিলা ব্রিগেড ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য পুরুষদের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন। আজ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেয়েরা যোগদান করছেন, স্থল-আকাশ-জল সর্বত্র স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। তাঁদের অনুপ্রেরণার জন্য নেতাজির ঝাঁসি বাহিনী নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী মাইলস্টোন। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

ভারতের মুক্তি সংগ্রামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

সুব্রত ভৌমিক

এ কথা সর্বজনবিদিত যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজী কলকাতার ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়তে আসেন এবং এখানকার বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। সে সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল কোকেন। বিপ্লবী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে থাকতে ডাক্তারজীর এই উপলব্ধি হয় যে বিপ্লবীদের মধ্যে সাহস, ত্যাগ, বীরত্ব সব কিছু থাকা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে বহুলাংশে সঠিক চেতনা ও বীরব্রতের অভাবে তারা বিপ্লবীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার সাহস দেখাতে পারেনি। ফলে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন বিপ্লবী প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ চতুর ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশরা বিপ্লবীদের দমন করতে বা ধরতে দেশীয় মানুষদেরই সাহায্য নেয়।

ডাক্তারজী এরপর নাগপুরে ফিরে এসে বিকল্প পথের সন্ধানে কংগ্রেসের একজন সক্রিয় সদস্যরূপে গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে গান্ধীজীর ডাকে কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে একত্রিত হচ্ছেন। তাই গুপ্ত বিপ্লবী কার্যকলাপের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ, নিঃস্বার্থ বুদ্ধি, ত্যাগের ভাবনা জাগানোর অর্থাৎ রাষ্ট্র চরিত্র নির্মাণের যে ঘাটতি ছিল তা হয়তো গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মাধ্যমে পূরণ হবে।

অসহযোগ আন্দোলন

ডাক্তারজী খুব শীঘ্রই বিদর্ভ প্রান্তের কংগ্রেসের দক্ষ ও সক্রিয় কার্যকর্তাদের মধ্যে অন্যতম হয়ে ওঠেন। সেই সময় নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেসের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর দুটি সিদ্ধান্ত ডাক্তারজীর ভাবনাকে জোর ধাক্কা দেয়। একদিকে মুসলমানদের কাছে টানার জন্য গান্ধীজীর অতি উৎসাহে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করে ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলমান তোষণের অশুভ সূচনা করে, অন্যদিকে যখন এরকম প্রস্তাব তোলা হয় যে গোরক্ষার প্রশ্নও রাষ্ট্রীয়, অতএব সে ব্যাপারেও কংগ্রেসের কিছু করা উচিত। তখন সেই কংগ্রেসই বলে যে মুসলমানদের ভাবনায় আঘাত লাগবে, তাই কংগ্রেস এ ব্যাপারে কিছু করতে অক্ষম। তা সত্ত্বেও, যেহেতু সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসই ছিল একমাত্র বড়ো মঞ্চ, ডাক্তারজী কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণে কোনও দ্বিধা দেখাননি।

১৯২১-এ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উগ্র ভাষণের জন্য ডাক্তারজীর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা শুরু হয়। মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ লেখক ও সাংবাদিক এবং ডাক্তারজীর ছাত্রজীবনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু ও একান্ত সহযোগী নারায়ণ হরি পালকর, যিনি এই মামলার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তাঁর লেখা 'ডাঃ হেডগেওয়ার' নামক জীবনী গ্রন্থের ১০০–১০৬ পৃষ্ঠায় এই মামলার বিস্তারিত বিবরণ আছে। মামলা চলাকালীন আত্মপক্ষ সমর্থনে তাঁর বক্তব্য শুনে বিচারক বলেন যে, এই বক্তব্য তাঁর আগের বক্তব্যের থেকেও আরও বেশি উত্তেজক ও রাজদ্রোহপূর্ণ। অবশেষে তাঁর ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের সময় নিরন্তর ও গভীর চিন্তনের ফলে তাঁর মনে প্রশ্ন ওঠে যে—

(১) আমরা জ্ঞান, বিজ্ঞান, সম্পদে শ্রেষ্ঠ জাতি হওয়া সত্ত্বেও বারবার পরাধীন হলাম কেন? বিশ্বগুরু ভারতের এরকম পতন কী ভাবে হলো? (২) মুষ্টিমেয় বিদেশি আক্রমণকারী আমাদের এই বিশাল জনসংখ্যা ও আয়তনের দেশে কীভাবে লুট, গণহত্যা, ধর্ষণ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণে সফল হলো? (৩) তুর্কি, মোগল, পাঠান, ব্রিটিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজদের মতো লুণ্ঠনকারী দস্যু ও বণিকদের সামনে আমাদের হাজার হাজার বীরব্রতী যোদ্ধা ও রাজা-মহারাজা কেন অসহায় হয়ে পড়লেন? (৪) যখন আমাদের চোখের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার বিশ্ববিদ্যালয়,

গ্রন্থাগার এবং সমগ্র মানবতার প্রেরণার স্রোত মঠ-মন্দির, আশ্রম ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হল, জ্বালিয়ে দেওয়া হলো, তখন তা আমরা প্রতিরোধ করতে পারলাম না কেন? (৫) এটা সত্য যে প্রায় ১২০০ বছরে অনেক হিন্দু বীর ও মহান ব্যক্তি আত্মবলিদানের মাধ্যমে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালিয়ে যান, কিন্তু ওই প্রতিরোধ জাতীয় স্তরে, সারা দেশজুড়ে ও সংগঠিতভাবে একসঙ্গে হলো না কেন? (৬) মোগল বা ব্রিটিশদের সঙ্গে রাজপুত, শিখ বা মারাঠা শক্তি পৃথকভাবে যুদ্ধ করল কেন? কেন যখন যে সবথেকে বেশি শক্তিশালী তার নেতৃত্বে অন্য শক্তিগুলি একজোটে যুদ্ধ করতে পারল না? (৭) ব্রিটিশ আজ অথবা কাল দেশ ছেড়ে যাবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু যে কারণগুলির জন্য আমরা বারবার পরাধীন হয়েছি এবং দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আমাদের মজ্জায় বিবেকানন্দের ভাষায় পরানুবাদ, পরানুকরণ ও দাসসুলভ মানসিকতা ঢুকে গিয়েছে দেশ স্বাধীন হলেই কি তা লোপ পাবে? আবার সেই আত্মকলহ, স্বার্থপরতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দেবে না তো? তার জন্য আবার আমরা পরাধীন হব না তো বা বিদেশি শক্তি আমাদের উপর ছড়ি ঘোরাবে না তো?

তিনি বুঝেছিলেন যে, স্বাধীনতা অর্জনের থেকেও স্বাভিমানের সঙ্গে তা রক্ষা করা আরও কঠিন। এবং সম্মানজনক ভাবে জীবন কাটানোর দুটি উপায় আছে—প্রথমত নিজেদের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য আত্মাহুতি দেওয়ার প্রস্তুতি এবং দ্বিতীয়ত একটি শক্তিশালী ও সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ।

অতএব স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই অজ্ঞাত সেনাপতি ডাঃ হেডগেওয়ার এই গভীর আত্মমন্থন থেকে উদ্ভূত সারতত্ত্ব সকলের সামনে ব্যক্ত করলেন—''আমাদের সমাজ ও দেশের পতন মুসলমান ও ইংরেজদের জন্য হয়নি, বরং রাষ্ট্রীয় ভাবনা শিথিল হওয়ার জন্য ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্বন্ধ বিগড়ে যায় এবং এই ধরনের অসংগঠিত অবস্থার কারণেই একসময় দশ দিকে দিগ্বিজয়ের ডঙ্কা বাজানো হিন্দু সমাজ হাজার বছর ধরে বিদেশিদের পাশবিক সত্তার নীচে পদদলিত।'' ডাক্তারজীর এই চিন্তন ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জন্ম।

স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ

সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর এক নবজাত সংগঠনকে বড়ো করে তোলার গুরুদায়িত্ব নিয়ে ডাক্তারজী অমানুষিক পরিশ্রম শুরু করেন। বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যার্থী প্রচারক পাঠানোর ব্যবস্থাও তাঁকে করতে হচ্ছিল। কিন্তু তার পাশাপাশি কংগ্রেসের আন্দোলনমুখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং অন্য স্বয়ংসেবকদেরও গান্ধীজীর নেতৃত্বে সমস্ত সত্যাগ্রহ ও এই ধরনের যে কোনও আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে সেই সময় সঙ্ঘ ছিল খুবই ছোটো এবং তাকে একটি বড়ো শক্তি মনে করা অতিশয়োক্তি হতো। বাঙ্গলা ও অসমের মতো দুটি বড়ো প্রদেশে ১৯৪০ পর্যন্ত সঙ্ঘ কাজ প্রায় শুরুই হয়নি। তামিলনাড়ুতে ১৯৪০-এ সঙ্ঘ সবে পা রাখে। ওড়িশাতে ১৯৫০ সালে মাত্র ৪টি শাখা ছিল। স্বাধীনতার আগে শুধু প্রান্তের কিছু অংশে সঙ্ঘের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল এবং মহারাষ্ট্রের বাকি অংশে ছিল তার থেকে কিছুটা কম।

সাইমন কমিশনের বিরোধিতা

১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের বিরোধিতা শুরু হয়। তখন নাগপুরে ১৮-২০টি মতো শাখা ছিল। ওয়ার্ধায় কাজ কিছুটা বাড়ছিল। ওই সব স্থানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ভালো সংখ্যায় কংগ্রেসের পতাকাতলে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন।

বিপ্লবী রাজগুরু ও ডাক্তারজী

সাইমন কমিশনের বিরোধ চলাকালীন লাহোরে পুলিশ অফিসার স্যান্ডার্সের লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে লালা লাজপত রাইয়ের মৃত্যু হয়। এর প্রতিশোধ নিতে ভগৎ সিংহ, সুখদেব ও রাজগুরু স্যান্ডার্সকে হত্যা করেন। নাগপুরে ভোসলে বেদশালার ছাত্র থাকার সময় রাজগুরুর সঙ্গে ডাক্তারজীর পরিচয় হয়। তিনি মোহিতবাড়ে শাখার স্বয়ংসেবক ছিলেন। রাজগুরু যথারীতি নাগপুরে এসে ডাক্তারজীর সঙ্গে দেখা করেন। ডাক্তারজী তাঁর সহযোগী কার্যকর্তা ভাইয়াজী দানীর ফার্ম হাউসে রাজগুরুর আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁকে পুনায় নিজের বাড়িতে যেতে বারণ করেন। এই সর্তকতা সত্ত্বেও রাজগুরু পুনাতে তাঁর বাড়ি যান এবং ধরা পড়েন। বিচারে ভগৎ সিংহ ও সুখদেবের সঙ্গে তাঁরও ফাঁসি হয়।

এই ভাবে ডাক্তারজী সঙ্ঘকাজে সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে সহমর্মিতা বজায় রাখতেন। কখনও কখনও তাঁদের সহযোগিতাও করতেন। গান্ধীজী যেমন স্বাধীনতা অর্জনে অহিংসাকেই একমাত্র পথ মনে করতেন, ডাক্তারজীর হিংসা-অহিংসা নিয়ে কোনও ছুতমার্গ ছিল না।

এইচ এম ঘোড়কে এই তথ্যকে আরও পুষ্ট করেছেন— ''Rajguru is the best example of impact of revolutionaries on Sangh. It was but natural that Doctor (Headgewar) would help Rajguru every possible way.'' H. M. Ghodke, ''Revolutionary Nationalism in Western India.'' Pages (173–174).

সঙ্ঘ শাখায় স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

১৯২৯-এর ডিসেম্বরে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই উপলক্ষ্যে কংগ্রেস দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১৯৩০-এর ২৬ জানুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই প্রসঙ্গে ২১-১-১৯৩০ তারিখে ডাক্তারজী আইনজীবী নুলকরকে চিঠি লেখেন—

''এই বছর নিজেদের লক্ষ্য রূপে 'স্বাধীনতা'-কে নিশ্চিত করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি রবিবার, ২৬-০১-১৯৩০ তারিখে সারা ভারতে 'স্বাধীনতা দিবস' উদ্‌যাপনের ডাক দিয়েছে।

''অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি আমদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে উন্নীত হয়েছে দেখে আমাদের স্বভাবতই প্রচণ্ড

আনন্দ হচ্ছে। স্বাভাবিক কর্তব্য রূপে আমাদের উচিত এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে যে কোনও সংগঠনকে সাহায্য করা।

''এজন্য রবিবার, ২৬-০১-১৯৩০ তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রত্যেক শাখায় সন্ধ্যা ঠিক ৬টায় সঙ্ঘস্থানে শাখার সকল স্বয়ংসেবক এক হয়ে রাষ্ট্রধ্বজ অর্থাৎ গৈরিক ধ্বজকে বন্দনা করবে। ভাষণে স্বাধীনতার অর্থ এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য যেন প্রত্যেকের জীবনে বদ্ধমূল হয় সেই ভাবনা বিশদে ব্যাখ্যা করুন। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যকে সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসকে অভিনন্দন জানিয়ে সভা শেষ করবেন।.....''

সেই মতো সঙ্ঘের প্রত্যেক শাখায় দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। এই বিষয়টি সঙ্ঘের কঠোরতম সমালোচক সুমিত সরকারও তাঁর 'খাকি শার্ট এন্ড স্যাফ্রন ফ্ল্যাগ' বইতে স্বীকার করেছেন।

আইন অমান্য ও জঙ্গল সত্যাগ্রহ

ডাক্তারজীর বিভিন্ন ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই আন্দোলনে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা এবং সংগঠন হিসাবে সঙ্ঘের ভূমিকা, সীমারেখা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ও দৃঢ় নীতিগত সিদ্ধান্তের বিশদ ধারণা পাওয়া যায়। নীচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি উদ্ধৃত করা হলো—

২৭-০৭-১৯৩০ তারিখে, কার্যকর্তাদের কাছে পাঠানো পত্র

কংগ্রেসের ডাকে জঙ্গল সত্যাগ্রহের সময় সঙ্ঘ এবং স্বয়ংসেবকদের ভূমিকা স্পষ্ট করে ডাক্তারজী লিখেছিলেন—

''সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিষয়ে সঙ্ঘের নীতি সম্পর্কে বারবার জানতে চাওয়া হচ্ছে। এই আন্দোলনে সংগঠন হিসাবে যোগদান করার বিষয়টি সঙ্ঘ এখনও নিশ্চিত করেনি। ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা সম্মিলিত হতে চান, তাঁরা সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়ে তা করতে পারেন, কোনও আপত্তি নেই।''

১৮-০৯-১৯৩০ তারিখে আইনজীবী নুলকরকে লেখা চিঠি

১৯৩০-এ গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি সঙ্ঘের তরুণ স্বয়ংসেবকরা আকৃষ্ট হয়েছিল। স্বয়ংসেবকদের এই মানসিক অবস্থার কারণে সঙ্ঘকাজের উপর যেন কোনও প্রতিকূল প্রভাব না পড়ে তার জন্য শাখার কার্যকর্তারা সচেষ্ট ছিলেন। এই বিষয়ে নুলকর মহোদয়ের (সঙ্ঘচালক, বিলাসপুর) লেখা পত্রের উত্তরে ডাক্তারজী লিখেছিলেন—

''..... বিলাসপুরের পরিস্থিতি দেখে আমরা কিছুটা চিন্তিত। কিন্তু আপনার পাঠানো চিঠিতে তা শুধরে যাওয়ার আশা থাকায় সন্তুষ্ট হলাম। চিন্তা হওয়াতেই এই চিঠি লিখছি। এই আন্দোলন থেকে সঙ্ঘকাজের কোনও ক্ষতি না হয়, এর অর্থ যেন কেউ এরকম না করেন যে সঙ্ঘ এই আন্দোলনের বিরোধী। কিন্তু সঙ্ঘকাজও রাষ্ট্রীয় কাজ, এ জন্য তা চালনা করা প্রত্যেক স্বয়ংসেবকের কর্তব্য। আমি আপনাকে আগেই জানিয়েছি যে, যে সব স্বয়ংসেবক এই আন্দোলনে যোগ দিতে চান তারা ব্যক্তিগতভাবে সঙ্ঘচালকের অনুমতি নিয়েই সত্যাগ্রহে যোগ দিন। কিন্তু যারা সঙ্ঘকাজের ভিত্তিস্তম্ভ, তাঁদের উপর সঙ্ঘকাজ চালানোর দায়িত্ব রয়েছে। সঙ্ঘ জানে যে এই আন্দোলনের ফলে রাষ্ট্রে জাগৃতি আসবে, কিন্তু স্বাধীনতা আসবে না। জাগৃতি আসবে এ জন্য সঙ্ঘ এই আন্দোলনের প্রতি বিরোধিতা নয় বরং সহযোগিতার মনোভাব গ্রহণ করেছে। সঙ্ঘের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে সহযোগিতা করব সঙ্ঘ এরকম চায় না। এরকম করাও উচিত নয়। সঙ্ঘের উপর ভীরুতার অভিযোগ নিরর্থক। সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক স্বাভিমানী। তারা কোনও ধরনের অপমান সহ্য করবে না, এই জন্য আন্দোলনের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়া উচিত নয়। এই বিষয়ে কারও সঙ্গে বাদ-বিবাদ নিরর্থক। নিজেদের কাজ ভালো ভাবে করে আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব ততটা সম্পূর্ণ সাহায্য আন্দোলনকে অবশ্যই করা উচিত। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এক-আধটা বাধা যদি আমাদের দ্বারাই দূর করা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই তা দূর করা উচিত।.....'' (সূত্র ঃ সঙ্ঘ নির্মাতাকে আপ্তবচন, ভারতীয় বিচার সাধনা, নাগপুর, পৃঃ ৫—৬)

নীতিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাক্তারজী যথারীতি সরসঙ্ঘচালকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়ে জঙ্গল সত্যাগ্রহ করলেন। তাঁর সঙ্গে আপ্পাজী যোশী ও দাদারাও পরমার্থও সত্যাগ্রহ করেন। তাঁর ৯ মাসের কারাবাস হয়। মূলত মধ্যপ্রান্ত যেখানে সেই সময় সঙ্ঘকাজ সব থেকে বেশি ছিল সেখানে আইন অমান্য আন্দোলনের সফলতায় স্বয়ংসেবকদের ভূমিকাই বেশি ছিল। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ জি এস হুদ্দার, নাগপুরের সঙ্ঘচালক বাবুরাও বৈদ্যের সঙ্গে অন্য অনেক বরিষ্ঠ কার্যকর্তা যেমন সীতারাম হেফর, নিলরাও গড়গে সত্যাগ্রহ করে চার মাসের কারাবাস ভোগ করেন। এঁদের অতিরিক্ত অন্য স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তাদের সংখ্যার অনুমান করা কঠিন, কারণ সকলেই সঙ্ঘ পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে কংগ্রেসের কার্যকর্তা, কর্মীরূপে সত্যাগ্রহ করেছিলেন। এমনকী ঘোরতর সঙ্ঘ বিরোধী কমিউনিস্ট নেতা নাম্বুদিরিপাদ স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সত্যাগ্রহে ডাক্তারজীর ভূমিকা স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর পুস্তিকা 'BJP–RSS : In the Service of the Right Reaction'-এ লিখেছেন—

''One of those who were highly impressed and inspired by the Savarkar thesis was Dr Headgewar, the founder of the RSS. A nationalist who participated in the Gandhi led movement, he continued to be a Congress man for a decade more and participated in the 1930 'Salt Satyagraha'.'' (P-8)

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পূর্ববর্তী অধ্যায়

ডাক্তারজীর দেহাবসানের পর দ্বিতীয় সঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী সঙ্ঘকাজ দেশব্যাপী বিস্তারের জন্য নিরন্তর ভ্রমণ শুরু করলেন। শ্রীগুরুজী সম্পর্কেও অভিযোগ করা হয় যে তিনি ব্রিটিশ বিরোধিতা করেননি ইত্যাদি। প্রথমত, আগেই আলোচিত হয়েছে যে, ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র ভাষণ, আন্দোলন ও জেলে যাওয়া এসব তো স্বয়ংসেবকরা কংগ্রেসের মাধ্যমেই করতেন। এর জন্য ডাক্তারজী সঙ্ঘের পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেননি। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের

পতনের জন্য আমরা দায়ী''। ডাক্তারজী তাঁর দূরগামী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সঙ্ঘকে একটি বিশুদ্ধ রাজনৈতিক দল রূপে প্রতিষ্ঠা করেননি। সেই জন্য রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে সঙ্ঘ বা সঙ্ঘ কার্যকর্তাদের ভূমিকা পর্যালোচনা করলে ভুল হতে বাধ্য। সঙ্ঘের শীর্ষ কার্যকর্তারা যে সব গুণের অভাবের জন্য আমরা ব্রিটিশের কাছে পরাধীন হই, সেই সব গুণ যেমন সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা, এক আদেশ পালনানুবর্তিতা (অর্থাৎ যতক্ষণ কেউ নেতা থাকবেন ততক্ষণ তাঁর নির্দেশ পালন করে যাওয়া, নানা মুনির নানা মত নয়), জাতপাত, ভাষা, প্রান্ত ইত্যাদির বিভেদের উপরে ওঠা দ্রুত আত্মস্থ করে জাতি হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ, সংস্কারিত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠার উপর সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন এবং স্বয়ংসেবকদের কাছেও একই আশা করতেন। ভারতবর্ষ বা হিন্দু সমাজের কোনও সমস্যার জন্য ব্রিটিশ বা অন্য কোনও শক্তির উপর দোষারোপ না করে নিজেদের দোষ দূর করার উপর গুরুত্ব দিতেন। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যও সেরকম হতো। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীগুরুজী ধর্মান্তরকরণের জন্য খ্রিস্টান ও মুসলমানদের ওপর দোষারোপ না করে নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছিলেন—

''বিদেশি মিশনারিরা এইসব অঞ্চলে কেমন করে কাজ করছে দেখুন। কী পরিমাণ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের পরিচয়ই না তারা দেয়! কত কষ্টই না তারা হাসি মুখে মেনে নেয়।.....'' তারপর তিনি আরও বলছেন—''অনেক কর্মী মন্দ যা কিছু তার জন্য অন্যকে দোষারোপ করার মধ্যেই আনন্দ পান বলে মনে হয়। অনেকে হয়তো দোষ চাপান রাজনৈতিক বিকৃতির উপর, অনেকে দোষ দেন খ্রিশ্চান, মুসলমান বা এ ধরনের অন্যান্য মতাবলম্বীদের কার্যকলাপকে। আমাদের কর্মীরা যেন এ ধরনের প্রবণতা থেকে নিজেদের মনকে মুক্ত রাখেন এবং আমাদের জনগণ ও আমাদের ধর্মের জন্য সঠিক প্রেরণা নিয়ে কাজ করেন '' (চিন্তা চয়ন, প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৬, ১৪৯)।

কিন্তু এ ধরনের দূরগামী ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলনের

সাভারকর ও গুরুজী

ক্ষেত্রেও শ্রীগুরুজী ডাক্তারজীর পথেই যেখানে যতটুকু করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করেছেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগও শ্রীগুরুজী ও সঙ্ঘের এই আপাত নিরীহ গতিবিধির আড়ালে গভীর কোনও উদ্দেশ্য আছে সেটা জানতে ও বুঝতে পেরেছিল। তাই একাধিক গোয়েন্দা প্রতিবেদন এই বলে সরকারকে সতর্ক করেছিল যে—

''যদিও ওপর থেকে দেখলে গোলওয়ালকরের গতিবিধি থেকে উৎপন্ন বিপদের সম্ভাবনা এখনও অনেক দূরের মনে হয়, কিন্তু তাঁর গতিবিধিকে অবাধে চলতে দিয়ে তাঁকে এক শক্তিশালী অনুশাসনবদ্ধ স্বয়ংসেবক দল, যাঁদের শান্তিভঙ্গ ও উপদ্রব সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যায় -- তার একছত্র নেতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া মানে অনাবশ্যক বিপদ ডেকে আনা।''

এরকম একাধিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১৯৩৫-এ স্বরাষ্ট্র দপ্তর মধ্য প্রান্তের সরকারকে Criminal law amendment Act (XIV of 1908)-এর ধারা ১৬ অনুযায়ী সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করতে বলে। অবশ্য মুখ্য সচিব জি এম ত্রিবেদী ১৯৪০-এর ২২মে জানান যে তা সম্ভব নয় কারণ প্রদেশ জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ উঠবে। এখানেই বিচার্য যে, সঙ্ঘ যদি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই চলত, তবে তাকে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করতে চাইবে কেন? পরবর্তী কালে শ্রীগুরুজীর সক্রিয়তায় সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি হলে, গোয়েন্দা প্রতিবেদন জানায় যে ''On 27 April 1942, at the training camp of the RSS at Pune, Golwalkar Condemed those who are selfishly helping the British Government. On 28 April, he declared that Sangh has resolved to do its duty even if the whole world goes against it and impressed on the voluntiers that they must be ready to sacrifice their lives for the cause of the Country.''

এই দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার কথা বলা অবশ্যই স্বাধীনতা আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়। যার জন্য ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের একটি প্রতিবেদন বলে, ''The organisation is intensely anti British and its tone is increasingly becoming militant.'' অর্থাৎ শ্রীগুরুজী সবসময় ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য বা আন্দোলনের কথা প্রকাশ্যে না বললেও তিনি ও তাঁর নেতৃত্বে সঙ্ঘ যে চাণক্য ও শিবাজীর যোগ্য উত্তরসূরীর মতো কৌশল অবলম্বন করেছিল এ ধরনের গোয়েন্দা প্রতিবেদন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন

বিদর্ভ প্রান্তের চিমুর নামক স্থানে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে একযোগে সমান্তরাল স্বাধীন সরকার গঠন

করে। সঙ্ঘ কার্যকর্তা দাদা নায়েক, বাবুরাও বেগাড়ে, আপ্পাজী এবং সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ সন্ত তুকোজি মহারাজ চিমুর আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন। রামদাস রামপুরে -সহ আরও কয়েকজন স্বয়ংসেবক পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। সঙ্ঘের রামটেক নগর কার্যবাহ বালাসাহেব দেশপাণ্ডের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য মৃত্যুদণ্ড হয়। পরে অবশ্য তিনি মুক্তি পান এবং পরবর্তী কালে 'বনবাসী কল্যাণ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১১ আগস্ট ১৯৪২, পাটনার সচিবালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সময় পুলিশের গুলিতে ৬জন আন্দোলনকারী মৃত্যুবরণ করেন। তার মধ্যে দেবীপদ চৌধুরি ও জগপতি কুমার নামে দুজন স্বয়ংসেবক ছিলেন। বরিষ্ঠ সাংবাদিক স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত ওঝা তাঁদের স্বয়ংসেবক পরিচয় নিশ্চিত করেন।

বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে গান্ধীজী ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু ৮ আগস্ট, ১৯৪২-এর মধ্যেই গান্ধীজী, নেহরু, প্যাটেল সমেত সমস্ত শীর্ষ নেতা বন্দি হওয়ায় আন্দোলন দিশাহীন হয়ে যায়। কারাগারের বাইরে থাকা কর্মীরা তখন কী করবেন? তাঁরা কোথায় গা-ঢাকা দেবেন? শুধু ব্রিটিশ পুলিশই নয়, দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা দলের নির্দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরিয়ে দিচ্ছিল। এমতাবস্থায়, শ্রীগুরুজী দূরদর্শিতার সঙ্গে সাধ্যমতো তাঁদের আত্মগোপনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

অরুণা আসফ আলি, যিনি 'বিয়াল্লিশের বিদ্যুৎ' নামে খ্যাত ছিলেন, ১৯৬৭-তে দিল্লি থেকে প্রকাশিত হিন্দি সাপ্তাহিক 'হিন্দুস্থান'-এর সম্পাদকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ''শীর্ষ নেতারা বন্দি হলে ৪২-এর আন্দোলন দিশাহীন হওয়ার পর আমি সঙ্ঘের দিল্লি প্রান্ত সঙ্ঘচালক লালা হংসরাজ গুপ্তার বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলাম। তিনি ১০-১৫ দিনের জন্য আমার আশ্রয় ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ..... পরে এক স্থানে দীর্ঘদিন থাকা ঠিক হবে না বলে, আমি এক বরযাত্রী দলের সঙ্গে মিশে অন্যত্র চলে যাই। ....'' জয়প্রকাশ নারায়ণও হংসরাজ গুপ্তার আশ্রয়ে ছিলেন, 'স্বাধীন সরকারের' জনক নানা পাতিলকে সতগরার সঙ্ঘচালক পণ্ডিত সাতওয়ালকরজী আশ্রয় দিয়েছিলেন। সোশ্যালিস্ট নেতা অচ্যুত পট্টবর্ধন ও সঙ্ঘের কঠোর সমালোচক গান্ধীবাদী নেতা মানে গুরুজী পুনার সঙ্ঘচালক ভাউসাহেব দেশমুখের বাড়িতে ছিলেন।

এছাড়াও সঙ্ঘের চতুর্থ সরসঙ্ঘচালক রজ্জু ভাইয়াও এই আন্দোলনে যোগ দেন, যা এমনকী 'ট্রিবিউনের' মতো সঙ্ঘ সমালোচক সংবাদপত্রও স্বীকার করেছে।

এই বিশদ আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনও পর্যায়েই সঙ্ঘ সংগঠন রূপে বা তার কোনও স্বয়ংসেবক ব্যক্তিগত ভাবে ব্রিটিশ সরকার ও প্রশাসনের সঙ্গে হাত মেলায়নি বা তাদের সহযোগিতা করেনি। এমনকী ঘোরতর সঙ্ঘ বিরোধী ও বামপন্থী ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র শত সমালোচনার মধ্যেও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও প্রকৃত সত্যটি স্বীকার করেছেন যে ডা. হেডগেওয়ার কখনই ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে হাত মেলাননি। (Communalism in Modern India, P. 332)

গান্ধীজী ১৯৩৪ সালে সঙ্ঘের ওয়ার্ধা শিবির পরিদর্শনে যান। সেই শিবিরের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে এতটাই ছাপ ফেলেছিল যে দীর্ঘ ১৩ বছর পর ১৯৪৭-এর ১৬ সেপ্টেম্বর দিল্লির ভাঙ্গি কলোনিতে সঙ্ঘের এক স্বয়ংসেবক সমাবেশে তিনি বলেন, ''আমি কয়েক বছর আগে সঙ্ঘের শিবিরে গিয়েছিলাম যখন হেডগেওয়ার জীবিত ছিলেন। আমি আপনাদের শৃঙ্খলা, অস্পৃশ্যতার সম্পূর্ণ বর্জন এবং কৃচ্ছসাধন ও সহজ সরল জীবন দেখে খুবই অভিভূত হই। তখন থেকে সঙ্ঘের কাজের আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, কোনও সংগঠন যদি সেবা ও আত্মত্যাগের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় তবে তা শক্তিশালী হয়ে বিস্তার লাভ করতে বাধ্য।'' দ্য হিন্দু, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭। গান্ধীজী সমগ্রেও একথা লিপিবদ্ধ আছে।

১৯৩৪ এর আগেই গান্ধীজীর ডাকে ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বয়ং ডাক্তারজী অসহযোগ ও জঙ্গল সত্যাগ্রহের জন্য দুইবার কারাবরণ করেছিলেন। ওয়ার্ধা শিবির দেখে প্রভাবিত গান্ধীজী ডাক্তারজীকে কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই সঙ্ঘের কাজ করার কথা বলেন। ডাক্তারজী সবিনয়ে তা প্রত্যাখান করেন। তারপরেও গান্ধীজী যদি দেখতেন ও বুঝতেন যে সঙ্ঘ ও স্বয়ংসেবকরা তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্বন্ধে নিস্পৃহ, নিষ্ক্রিয় ছিল বা কমিউনিস্টদের মতো ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই আন্দোলনের বিরোধিতা বা অন্তর্ঘাত করেছে, তাহলে কি তিনি ১৯৪৭-এ স্বয়ং সঙ্ঘ শাখায় উপস্থিত হয়ে সঙ্ঘের প্রশংসা করতেন?

সঙ্ঘ সংগঠন রূপে কোনও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবে না। সঙ্ঘের এই নীতিগত সিদ্ধান্ত ডাক্তারজী বারবার নির্দ্বিধায় ও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে গোপনীয়তার কিছু নেই। যে কোনও গবেষক বা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক এসব জানেন এবং জেনে-বুঝেই তাঁরা ডাক্তারজী ও সঙ্ঘের মূল্যায়ন করেছেন।

১৯৭২ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৮৫৭ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত যে সব ব্যক্তি জাতীয় নেতা (National Hero) রূপে চিহ্নিত হয়েছেন, ভারত সরকারের উদ্যোগে তাঁদের জীবনী রচনার দায়িত্ব মোট চারখণ্ডে কলকাতার 'ইনস্টিটিউট অব্ হিস্টোরিক্যাল স্টাডি' নামক সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের প্রকাশিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ডাক্তারজীকে একজন মহান দেশপ্রেমিক, মনীষী ও বিপ্লবী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সময় কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। তাঁদের নিযুক্ত ঐতিহাসিকদের সংস্থা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতো যে, ডাক্তারজীর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ ও তার স্বয়ংসেবকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি, তাই ডাক্তারজী ও সঙ্ঘ ব্রিটিশের সহযোগী ছিলেন, তাহলে কি তাঁরা ডাক্তারজীকে দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী ও সর্বোপরি জাতীয় নেতার মর্যাদা দিতেন? সমালোচকরা কী বলেন? □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

গুণধর হাজরা নীলমণি হাজরা

অবিভক্ত মেদিনীপুরের অগ্নিপুরুষ

প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ পরাধীনতার শিকল ভাঙতে ভারতের বুকে একের পর এক আন্দোলন গড়ে ওঠে গান্ধীজীর নেতৃত্বে। 'আইন অমান্য' ও 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর রেশ ধরেই ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ঢেউ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। সেই সময়ে পরাধীন ভারতে তিন জায়গায় স্বাধীন সরকার গঠিত হয়। মহারাষ্ট্রের সাতারা, উত্তরপ্রদেশের বালিয়া ও বাঙ্গলার তাম্রলিপ্তে।

বলাই বাহুল্য ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত মেদিনীপুরের ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। সতীশ চন্দ্র সামন্ত, সুশীল ধাড়ার নেতৃত্বে ৪২-এর আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে তমলুক। বুক চিতিয়ে লড়াই করেন মেদিনীপুরের বীর সন্তানেরা। ১৯২০ সালে 'অসহযোগ আন্দোলন'-এ সক্রিয় ভূমিকা নেন গুণধর হাজরা। মহিষাদলের রথতলায় তাঁর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ বিদেশি জিনিসপত্র বর্জন করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেফতার করে গুণধর হাজরাকে। এরপর তিনি মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অবিভক্ত মেদিনীপুরে তিনিই 'অসহযোগ আন্দোলন'-এর প্রথম মৃত্যুবরণ করেন।

গুণধর হাজরার বংশধর হলেন নীলমণি হাজরা। তিনিও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন দক্ষ সংগঠক। মহিষাদলের কংগ্রেস সংগঠন আরও মজবুত হয় তাঁর উপস্থিতিতে। 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন'-এর প্রথম সৈনিক যদি সুশীল ধাড়া হন তবে, তালিকায় দ্বিতীয় নামটাই হচ্ছে নীলমণি হাজরার।

গুণধর হাজরা ও নীলমণি হাজরার নামে মহিষাদলের তাজপুরে একটি বিশ্রামাগার আছে। কিন্তু এইটুকুই। মেদিনীপুরের দুই অকুতোভয় স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এর বেশি কিছুই করেনি পশ্চিমবঙ্গের কোনো সরকার। এই নিয়ে যথেষ্ট আক্ষেপ রয়েছে হাজরা পরিবারের বর্তমান সদস্যদের মনে। আক্ষেপ ঝরে পড়েছে নীরমণি হাজরার ডায়েরি'র লেখক হরিপদ মাইতির লেখাতেও। □

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা

ঋতাসনা সরকার

ভৌগোলিক ধারায় দেশ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। কিন্তু সংবেদনশীল হৃদয়ে ভূগোলের এই ধারণাকে ছাপিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে দেশের একটি অন্যরকম তাৎপর্য। দেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তৈরি হয় দেশাত্মবোধ বা স্বদেশচেতনা। দেশ কেবল মাটি দিয়ে গড়া নয়, মানুষ দিয়ে গড়া, একথা বলে গেছেন রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে সমস্ত মনীষী। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। যদিও তাঁর অনেক আগে থেকেই শিক্ষিত বাঙ্গালিদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হচ্ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত টপ্পা গায়ক রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবুর কথায় যেখানে তিনি বলছেন—

''নানান দেশের নানান ভাষা/বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?
কত নদী সরোবর/কিম্বা ফল চাতকীয় / ধারাজল বিনে কভু মিটে কি তৃষা?'

এই কথায় স্পষ্টই ফুটে ওঠে তাঁর স্বদেশি ভাষার প্রতি প্রীতি ও মমত্ববোধ।

এই স্বদেশচেতনার কিঞ্চিৎ ব্যাপ্তি ঘটেছিল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায়। সে কারণেই হয়তো তাকেই অনেকে আধুনিক অর্থে স্বদেশ চেতনার কবি বলেছেন। যদিও তাঁর এই স্বদেশচেতনা স্ববিরোধমুক্ত ছিল না। তাই তাঁর লেখায় ধরা পড়ে সমকালীন বাবু সমাজের ভণ্ডামি, ব্যাভিচার ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতা, যা তাকে আরও বেশি করে বাঙ্গলার লৌকিক ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার পথে অগ্রসর করেছিল। একে কেউ কেউ তাঁর হিন্দু রক্ষণশীল মানসিকতা বলে কটাক্ষ করেন। কিন্তু তাঁর লেখা 'মাতৃভাষা' ও 'ভাষা' শীর্ষক কবিতা দুটিতে নিধুবাবুর মতো বঙ্গভাষার প্রতি প্রীতি টের পাওয়া যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন দুইজন। তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে দেশকে ভালোবাসার আকুলতায় কোথাও কোনো ফাঁক ছিল না। যদিও দুজনের দেশপ্রেমের প্রকাশভঙ্গি ছিল দুরকম। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পররাজ্যগ্রাসীর প্রতি তাঁর ঘৃণাকে তিনি কীভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি অনার্য রাবণকে যে 'Grand fellow' বলে মনে করেছিলেন তার পিছনে তাঁর স্বাদেশিক চিন্তা কাজ করেছিল। তিনি বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতিকে সম্মান করলেও ব্রিটিশকে তিনি মনে করতেন আক্রমণকারী পররাজ্যগ্রাসী। উপনিবেশিক ভারতে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করতে শুরু করেছিল শিক্ষিত ভারতবাসী উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। বিদেশি শাসনের বেড়ি থেকে মুক্ত হওয়ার বাণী প্রথম শোনালেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'পদ্মিনী' উপখ্যান পড়লে বোঝা যায় একাজে তিনি রাজপুত বীরদের স্বরাজ্য রক্ষার মরণপণ লড়াইকে কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যুদ্ধগামী দেশপ্রেমিক বীরদের উদ্দেশে রানা ভীমসিংহের সেই উৎসাহিত বাণী—

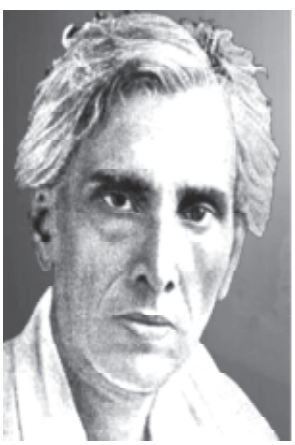
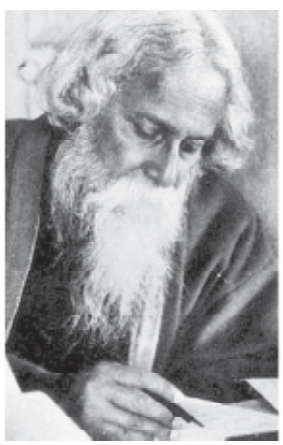

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে / কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে/কে পরিবে পায়।'

বস্তুত দেশপ্রেম বা স্বদেশ চেতনার আবেগ প্রথম ফুটে ওঠে বাংলা কাব্য সাহিত্যে। দেশচেতনা সমৃদ্ধ বাংলা কবিতার মধ্যে মূলত যে প্রবণতাগুলি দেখা গিয়েছিল সেগুলি হলো—

(ক) মাতৃভূমিকে চিন্ময়ী রূপে বন্দনা। (খ) পরাধীনতা থেকে মুক্তিলাভের আকুলতা। (গ) দেশসেবায় জীবনকে উৎসর্গ করার প্রেরণা দান।

(ঘ) মাতৃভাষার বন্দনা এবং (ঙ) সর্বপরি দেশের অতীতের সমৃদ্ধির বিপরীতে বর্তমান শ্রীহীন দশায় বন্দিদের আর্তবেদনার প্রকাশ।

স্বদেশচেতনা উনিশ শতকে আর যার মধ্যে প্রবলভাবে মূর্ত হয়েছিল তিনি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্‌গাতা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জাতীয় ভাবনা প্রথম থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচলিত করেছিল। সেই কারণে তিনি জাতীয় সংগীত রচনায় তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তাঁর আগে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখে ফেলেছেন—'মিলে সবে ভারতসন্তান / একতান, মন-প্রাণ/গাও ভারতের যশোগান।' বঙ্কিম বঙ্গদর্শনে এই গানকে সংবর্ধিত করেছেন। ১৮৮২ খ্রিঃ 'বন্দে মাতরম্' গানটি প্রকাশিত হয়। ১৮৯৬ খ্রিঃ কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গানটি পরিবেশন করেন। অবশ্য এর আগের বছর মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি রূপে এক ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করেন। এই গানটি বিপুলভাবে রণধ্বনি হিসাবে ব্যবহৃত হয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে। কালা আইন সার্কুলারের বিরুদ্ধে ছাত্ররা স্লোগান দিতে গিয়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করেছিল। ১৯০৫ সালে 'বন্দে মাতরম্ ভিক্ষু সম্প্রদায়' গঠিত হয় যারা এই গান গেয়ে পথে পথে অর্থ সংগ্রহ করত। এই গান বা ধ্বনির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল স্বদেশচেতনার আবেগ যাকে সম্বল করে ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিনের বিপ্লবীরা। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গালির স্বদেশপ্রেম জাগরণের অন্যতম হোতা। তিনি তাঁর 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমের আবেগ ও পরাধীনতার যন্ত্রণাকে ভাষারূপ দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের শেষে কমলাকান্ত উপলব্ধি করেছেন যে তিনি আর একা নন, ভয়ার্ত নন, শিকড়হীন নন, তাঁর পাশে আছে ছ' কোটি দেশবাসী তাদের বারোকোটি বাহু নিয়ে।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার আলোচনায় যার কথা না বললে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যার সাহিত্যচর্চার এক অংশ জুড়ে রয়েছে দেশের প্রতি অপার মমত্ববোধ এবং দেশের মানুষকে স্বাধীনতা লাভের প্রয়াসে উৎসাহিত করার প্রবল বাসনা—তিনি রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ি প্রথম থেকেই ছিল স্বদেশি চিন্তায় ভরপুর। 'হিন্দুমেলার' পরিকল্পনা এখান থেকে হয়। সেই মেলাতে চতুর্দশ বর্ষীয় বালক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'হোক ভারতের জয়' ও 'হিন্দুমেলার উপহার' বলে দুটি কবিতা। পরে মানসী কাব্যে বেশ কয়েকটি স্বদেশচেতনামূলক কবিতাও লেখেন। 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'দুরন্ত আশা' প্রভৃতি কবিতায় কবি কখনো বিদ্রূপের ছলে, কখনো-বা মহত্তম আকুতির মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রেমকে ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া আছে তার স্বদেশ পর্যায়ের গান। স্বদেশি আন্দোলনকে আরও গতিশীল ও উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে স্বদেশ পর্যায়ে মোট ২৭টি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—'সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক', 'আজি বাঙ্গলাদেশের হৃদয় হতে', 'ও আমার দেশের মাটি' ইত্যাদি। ১৯০৫ সালে বড়লাট কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অঙ্গরূপে স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলন শুরু হলে রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন। ওই বছর ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দিন। ওই দিন বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালি জাতি তার ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত রাখিবন্ধন ছিল এই কর্মসূচির একটি অন্যতম অঙ্গ। বাঙ্গলার মানুষ নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখতে পরস্পরের হাতে হলুদ সুতোর রাখি পরিয়ে দেয় এবং মাতৃভূমিকে অখণ্ড রাখার এবং ঐক্য বজায় রাখার শপথ নেয়।

বাংলা সাহিত্যে আর এক নক্ষত্র যাঁর চেতনায় দেশপ্রেম এক অনন্য মাত্রা লাভ করেছিল। ইংরেজের রক্তচক্ষুর সামনে তার কলম স্পর্ধার সাক্ষ্য রেখেছে—তিনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে স্বদেশচেতনার এক অন্য ভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখা—'কারার ওই লৌহকপাট্', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' প্রভৃতি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী এই পর্বে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকার অবদানও কম ছিল না। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য বড়লাট লিটন ১৮৭৮ সালে পাশ করেন 'Vernacular Press Act'। তার আগেই চালু হয়েছিল 'Dramatic Performance Act'। কারণ এই পর্বে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী', 'শরৎ-সরোজিনী' প্রভৃতি নাটকের অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের বিরোধিতা করে জাতীয়তাবধের প্রসার ঘটেছিল।

পরবর্তী সময়ে এই নাটকগুলির সূত্র ধরেই বাংলা সাহিত্য জগতে স্বদেশচেতনামূলক নাটকের সূত্রপাত ঘটে। যা সেকালের সরকারের টনক নড়িয়ে দেয়। আর তাই ১৮৭৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নিয়ে আসে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন। বাঙ্গালির চিত্তে পরাধনীতার মর্মজ্বালা ও আত্মজাগরণের প্রথম নিদর্শন ছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক। ভারতীয় কৃষকদের উপর ইংরেজ বণিকদের অর্থনৈতিক অত্যাচার ও শোষণের অশ্রু যেন এই নাটকের সর্বাঙ্গে জমাট বেঁধে আছে। তাই এই নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীলকর সমিতির সভ্যরা আইনের দ্বারস্থ হয় এবং নাটক বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। পরে এই নাটকের অনুকরণ 'চা-কর দর্পণ', 'জমিদার-দর্পণ' নাটক তৈরি হয়। এই স্বদেশ চেতনার ঢেউ পরবর্তী বাংলা নাট্যকারদের চিত্তেও সমানভাবে বিচরণ করেছিল। মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু প্রমুখ নাট্যকার জাতির মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দুমেলার জাতীয়তার আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। স্বদেশ আন্দোলনপর্বে আরও এক নাট্যতারকা হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম' নাটকে ইংরেজ বিরোধিতা খুব স্পষ্ট।

এই পথ ধরেই এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো—'প্রতাপ সিংহ', 'মেবার পতন' প্রভৃতি। তাদের এই স্বদেশ ভাবনাকে আত্মস্থ করেই পরবর্তী সময়ে এসেছেন মন্মথ রায়, শচীন সেনগুপ্ত, বিজন ভট্টাচার্যের মতো নাট্যকারগণ।□

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

কদম কদম বাড়ায়ে যা...

মনোজিৎ সরকার

পূর্ণাঙ্গ ফিলিমের মর্যাদা তখনও পায়নি দেশি চলচ্চিত্র। মূক থেকে সরব হচ্ছে ভারতীয় বায়োস্কোপের উত্তর অঙ্গন। সিনেমার বিষয় আধ্যাত্মিক থেকে ধীরে ধীরে সামাজিক। সেখানেও এল রাজনীতি তথা স্বাধীনতার অমোঘ ছোঁয়া। প্রতিবাদের নতুন হাতিয়ার।

দূর হটো ইয়ে দুনিয়াওয়ালো, কবি প্রদীপের জ্বলন্ত লেখায় অনিল বিশ্বাস মশাইয়ের দুরন্ত সুরারোপে আমিরিভাই কর্ণাটকি-র কণ্ঠে এই গানে মেতে উঠল সাধারণ দর্শক। স্বাধীনতাকামী শ্রোতা। ১৯৪৩ সালে 'কিসমত' ছবির গানে ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করলেন নির্মাতারা। বাংলায় তখন রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-ডি এল রায় ঝড় তুলছেন একের পর এক। ঋষি বঙ্কিমের বন্দেমাতরমে আসমুদ্র হিমাচল আলোড়িত। 'কারার ওই লৌহকপাট, চল চল চল, উর্দ্ধ গগনে...' এই সময় হিন্দি ছবি 'শহীদ'-ও ছিল লড়াইয়ের নবতম অঙ্গীকার। গল্পে দিলীপকুমার এক স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি নেতাজি সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক। তারই লিপে রাজা মেহদি আলির লেখায় গুলাম হায়দারের সুরে রফি সাহেবের কণ্ঠে 'ওয়াতান কি রাহ মে / ওয়াতান কে নওজোয়ান শহীদ হো'— প্রাক ও উত্তর স্বাধীনতাকালে কবি প্রদীপের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯১৫ সালে জন্ম। পুরো নাম রামচন্দ্র নারায়ণজী দ্বিবেদী। ডাক নাম প্রদীপ। ১৭০০ গান লিখেছেন। ৭২টি ছবিতে গান লিখেছেন। ১৯৪০-এ বন্ধন ছবি দিয়ে শুরু, এই ছবিতে 'চল চল রে নওজোয়ান' গানের মধ্য দিয়ে রাতারাতি পরিচিতি পান। তবে তাঁর লেখা 'ইয়ে মেরে ওয়াতান কি লোগো', যেটা সি রামচন্দ্রের সুরে লতা মঙ্গেশকর গেয়েছিলেন, আজও চোখে জল আনে। চিন যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানকে সর্বকালের অন্যতম সেরার শিরোপা দেওয়া যায়। হেমন্ত মুখার্জির উদাত্ত কণ্ঠে 'গঙ্গা যমুনা' ছবিতে শকিল বাদাউনের দুর্দান্ত লেখনীতে 'ইনসাফ কি ডগর পে' জনপ্রিয় হয়।

'কদম কদম বাড়ায়ে যা' ১৯৪১-এ তৈরি এই গান সেদিনের স্বাধীনতাকামীদের সঙ্গে সঙ্গে আজও এদেশে সৈন্যদের মার্চ পাস্টে ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি, লিখেছিলেন রামসুন্দর শুক্লা। রামসুন্দর শুদু কবি নন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীও ছিলেন। এই গানে সুরসংযোজন করেছিলেন আর এক স্বাধীনতা সংগ্রামী রাম সিং ঠাকুর।

নেতাজী সুভাষ থেকে গান্ধী, নেহেরু সকলকে অভিভূত করেছেন আলেম্মা মহম্মদ ইকবাল। তাঁর 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা' গানের মাধ্যমে। ১৯০৪ সালে ইত্তেহাদে নামের এই গানটির প্রথম প্রকাশ। ১৮৭৭-এ জন্ম ইকবালের, পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। লাহোর কলেজের ছাত্র, লালা হরদয়ালের অনুরোধে এই গানটি সেই কলেজে গেয়ে শোনান ইকবাল। ১৯৪৫-এ পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই গানটির বর্তমান সুরটি সংযোজন করেন আই পি টি এর জন্য।

'সরফরোশি কি তমান্না' লতা মঙ্গেশকরের কিন্নর কণ্ঠে গাওয়া গানটির রচনাকাল ১৯২২। উর্দু কবি বিসমিল আজিমেকাদিরের লেখা। ইনিও স্বাধীনতা সংগ্রামী। বিহারের পাটনায়

১৯০১ সালে জন্ম। এরই মতো 'জাঁহা ডাল ডাল পর, সোনে কি চিড়িয়া' গানটি মহঃ রফির কণ্ঠে খ্যাত। সুর দেন হংসরাজ ভেল। লেখেন রাজেন্দ্র কৃষ্ণন। হংসরাজের জন্ম ১৯১৬ সালে আম্বালাতে। হিন্দি ও পঞ্জাবীতে বহু বিখ্যাত গানের সুরকার হংসরাজ।

'কর চলে হম ফিদা / জান ও তন সাথিও', মহঃ রফির কণ্ঠে 'হকিকৎ' ছবির এই গান 'কৈফি আজমি'র লেখা, অসাধারণ সুরটি মদনমোহন-এর। এই গানের সুরকারের চোখে জল আনার যে কারুকার্য তা আজকের সুরকারদেরও শিক্ষণীয়। মদন মোহোন কোহলির জন্ম পরাধীন ইরাকের বাগদাদে। ১৯৩২-এ পঞ্জাবের ঝিলম প্রদেশে চকওয়ালে আসেন, কার্তার সিং-এর কাছে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিতে। পরে উস্তাদ ফৈয়াজ খান, উস্তাদ আলি আকবর, বেগম আখতারের সাহচর্যে আসেন। শচিনদেব বর্মনের সঙ্গে ছিলেন কিছুকাল।

'মেরে দেশ কি ধরতি, সোনা উগলে..' উপকার ছবির এই গানটি মহেন্দ্র কাপূরের কণ্ঠে মনোজ কুমারের লিপে শুনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আনন্দিত হন। কারণ শাস্ত্রীজীই মনোজ কুমারকে রাজি করিয়েছিলেন 'জয় জওয়ান জয় কিষান' ভিত্তিক একটি ফিল্ম তৈরি করতে। সেইমতো তৈরি হয় 'উপকার' ছবিটি। কল্যাণজী আনন্দজীর সুরে গান লেখেন গুলশন বাওরা। আসল নাম গুলশন কুমার মেহতা ছদ্মনাম বেওরা। গুলশন ২৪২টি গান লেখেন। 'তাকত ওয়াতন কি হমসে হ্যায়', প্রেম পূজারি ছবিতে এই সুপারহিট দেশভক্তির গানটি গান মান্না দে ও মহঃ রফি। শচিন দেবের সুরে গানটি লেখেন নীরজ। এই নীরজের আসল নাম গোপাল দাস নীরজ সাক্সেনা। উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া জেলায় তাঁর জন্ম ব্রিটিশ-ভারতে। 'লিখে যো খত তুঝে', 'জীবন কি বগীচা'-র মতো হিটগান তাঁর কলমেরই ফসল।

শেষে একটি বাংলা গানের কথা। গানটি বাঙ্গলা ও বাঙ্গালিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধচারণ করায় ফাঁসি হয় ক্ষুদিরাম দাসের, ১১ আগস্ট ১৯০৮ সালে। সেটা স্মরণ করে পীতাম্বর দাশ এই গান বাঁধেন চোখের জল দিয়ে। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি / হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী.....

বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহ

বাঙ্গলার জনজাতিরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন কৃষক বিদ্রোহ। ব্রিটিশরা এই বিদ্রোহের নাম দিয়েছিল 'চুয়াড় বিদ্রোহ'। বাংলার জেলায় জেলায় আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল এই বিদ্রোহ। শেষে ব্রিটিশ সরকার কড়া হাতে এই বিদ্রাহ প্রতিরোধ করতে কুখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়োগ করে। তবে, ব্রিটিশদের তীব্র দমননীতিও থামাতে পারেনি চুয়াড় বিদ্রোহকে। নতুন নতুন নামে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া সহ সমগ্র রাঢ়বঙ্গ ও ছোটনাগপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এই বিদ্রোহ। মেদিনীপুরের গড়বেতা, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, কেশপুর, শালবনী, শিলদা, লালগড়, রামগড় প্রভৃতি এলাকায় 'বাগড়ী নায়েক বিদ্রোহ' বা 'পাইক বিদ্রোহ' রূপে এই আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। নেতৃত্বে ছিলেন গড়বেতার বাগড়ী রাজবংশের রাজা ছত্র সিংহের বিশ্বস্ত পাইক সর্দার অচল সিংহ। তাঁর নেতৃত্বেই ১৮০৬ থেকে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনজাতি সম্প্রদায়ের লোধা, শবর, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ভূমিজ, বাগদী, কুড়মি, পাইক ও নায়েকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আন্দোলন যখন তুঙ্গে, ইংরেজরাও অত্যাচারের সীমা বাড়ালো। ১৮১৫ সালে চার্লস রিচার্ড ও মিস্টার হেনরি নামে ২ জন অত্যাচারী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠানো হল। তারা চন্দ্রকোণার বসনছড়া এলাকার একটি ফাঁকা মাঠে তাঁবু খাটিয়ে বিচারালয় স্থাপন করল। একটি বটগাছের নীচে তৈরি হলো ফাঁসির মঞ্চ। ১৮১৫-১৮১৬ সালের মধ্যে ওই ফাঁসির মঞ্চেই গড়বেতা ও চন্দ্রকোণা এলাকার নায়েক বিদ্রোহের নেতা যুগল, কিশোর, সুবল, রাজেন, হাবল, ফাগু প্রমুখ ১৪ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, সেই সময় ওই এলাকায় দারোগা ছিল নিত্যানন্দ নামে এক ভারতীয়। কুখ্যাত ও ঐতিহাসিক সেই স্থানটিই পরবর্তীকালে ফাঁসিডাঙা নামে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের প্রধান নেতা অচল সিংহকে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজরা গুলি করে হত্যা করে।

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা যুগের ‘কলম’ বনাম আজকের ‘ফেক আর পেড নিউজ’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

স্বাধীনতা যুগের নিছক ‘কলম’-এর ভূমিকা লিখে দায় সারলেই এ লেখা শেষ হতো না। সে সময়ের ৪৭টি সংবাদপত্রের নাম আর তাদের কয়েকটি লেখার উক্তি তুলে দিয়েই কাজ সেরে ফেলা যেত। কয়েক লাইন পড়েই পাঠক ক্লান্ত হয়ে যেতেন। তখন সংবাদপত্রের একটি টার্গেট বা লক্ষ্য ছিল—জনমত তৈরির মধ্যে দিয়ে অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তির অপসারণ। আর এখন ‘বহু’ টার্গেট। তাই তুলনা চলে না। বলতে দ্বিধা নেই বহুমুখী টার্গেটের উদ্ভাবনী শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বেশি। এর অন্যতম কারণ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতি। তবে মূল্যবোধ অনেকটাই ক্ষয়ে গিয়েছে। সে সময়ের ব্রিটিশ সমর্থক ‘দ্য স্টেটসম্যান’ পত্রিকা সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্র বসু বলতেন ‘স্টেটসম্যান প্রশংসা করলে বুঝব আমি ভুল করছি। নিন্দা করলে বুঝব আমি ঠিক।’ এ কথার কোনও রেকর্ড নেই। তারও আগে ১৯০৭-১৯০৯-এ যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ ও কর্মযোগিন পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দর লেখা নিয়ে ব্রিটিশ সংসদ তোলপাড় হয়। বিংশ শতকের প্রথম দশকে কর্মযোগিনে একজন ভারতীয়ের লেখা নিয়ে প্রায় একবছর তর্ক করেছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। এ ঘটনা নজিরবিহীন ও অজানা। তেমনি ছিল ‘সান্ধ্য’ বা ‘কেশরি’-র মতো কাগজ। গান্ধীজীর ‘হরিজন’ পত্রিকাও সামাজিক অভিশাপের বিরুদ্ধে কলম ধরে। তবে সব লেখাই ছিল দীর্ঘমেয়াদি ও ইস্যু ভিত্তিক। এখন তা তাৎক্ষণিক ও ব্যবসায়িক। সাময়িক রাজনৈতিক ইস্যুর উপর নির্ভরশীল। এই লেখায় স্বাধীনতার লড়াইয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকার ঐতিহ্য বা লেগ্যাসি তুলে ধরাই কাজ। বহুদিন থেকেই সাংবাদিক মহলে একটা কথা চালু আছে ‘নিউজ বা খবর সেটাই যা শাসক বন্ধ করতে চায়।’ স্বাধীনতা পূর্ব আর উত্তর যুগে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। তবে ইদানীং ‘ফেক বা পেড নিউজ’-এর দাপটে সংবাদপত্রের সে সম্মান ও স্বাধীনতা অনেকটাই ফিকে। অর্থের বিনিময়ে সংবাদ পরিবেশন হলো ‘পেড’ নিউজ। স্বাধীনতা যুগের কলম আজ শুধুই বিচারের বাণী যা নীরবে পড়ে কাঁদছে। তবু সে কলমের ক্ষয় বা লয় নেই। সংবাদ পরিবেশন যে নিছক ব্যবসার সামগ্রী নয়, তার সঙ্গে জুড়ে আছে মূল্যবোধ, সততা ও ভালবাসা, স্বাধীনতা যুগের সাংবাদিকদের কাছে তাই ছিল পাথেয়। সংবাদ পরিবেশনের কায়দা পালটে গেলেও সংবাদের যাথার্থ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন চলে না। সে যুগে বা এ যুগে। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা বলেছিলেন বিনয়ক দামোদর সভরকর বা বীর সভরকর। কার্ল মার্কসও তাই মনে করেছিলেন। দুজনেই এ বিষয়ে গ্রন্থ লেখেন। ওঁদের কথা মেনে নিলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ৯০ বছরের মধ্যে আনুমানিক ৪৭টি সংবাদপত্র দেশবাসীকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করত। আজ তার সবটাই প্রকাশিত। নতুন করে সে মালা গাঁথা অর্থহীন। করিডর লড়াইয়ের নায়ক দীনেশের ফাঁসির পর সংবাদপত্রে হেডিং হয় ‘ডন্টলেস দীনেশ ডাইজ অ্যাট ডন’ অর্থাৎ ‘ভোরেই মৃত্যু ভয়হীন দীনেশের’। এ ধরনের হেডিং আজকের দিনে বেমানান। গান্ধী বা সুভাষচন্দ্রকে আটকানোর জন্য ব্রিটিশ যতটা ক্ষমতার অপব্যবহার করত তার চাইতে অনেক বেশি দমনপীড়ন চালাত সংবাদপত্রের উপর। ভারতীয় সংবাদ ও সংবাদপত্রের বয়স আন্দাজ ২৪১ বছর। স্বাধীনতার লড়াইয়ের ‘কলম’-এর বয়স ৯০ বছর। তাতে সাহেব বিরোধিতায় ভাটা পড়েনি। এই অল্পবয়সি মাধ্যমের

ধাক্কায় ত্রাহি রব তুলেছিল ব্রিটিশ। ৪৭টি দৈনিক ও পাক্ষিক কাগজের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা সেই সময় যেমন করেছিল ব্রিটিশ আজও সেই ট্রাডিশন চলেছে। এখানে তার ফিরিস্তি তুলে ধরার প্রয়োজন নেই।

জেমস অগস্টস হিকি-র হাত ধরে ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশ ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি। নাম ছিল 'বেঙ্গল গেজেট বা ক্যালকাটা জেনারেল অ্যাডভাইজার'। প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ ঘটে। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন হিকি। পরবর্তীতে সে ঐতিহ্য বহন করে স্বাধীনতাকালের ৪৭টি সংবাদপত্র। তাদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' ছাড়াও ছিল 'দ্য হিন্দু', 'ইন্ডিয়ান মিরর', 'ট্রিবিউন' বা 'বঙ্গদর্শন'। সেই সময়

Calcutta Gazette.
EXTRAORDINARY.

'মোসোলমান' নামে একটি পত্রিকাও ছিল। পাশাপাশি ছিল গান্ধীজীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া ও ইন্ডিয়ান ওপিনিয়ন'। সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি পত্রিকা বের করেন। এরা সবাই ব্রিটিশ বিরোধী জনমত তৈরির সংবাদ ছাপতেন। তুলে ধরতেন রাজশক্তির অন্যায় জুলুমবাজি আর অত্যাচারের বিস্তারিত বিবরণ। পাশাপাশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার এমনকী সশস্ত্র আন্দোলনের ডাকও দেওয়া হতো। আগেই বলেছি 'কলম' বা সংবাদপত্রের সামনে তখন ছিল 'ভিশন' বা 'দূরদর্শিতা'। আর এখন তার বিন্দুমাত্র নেই। সংবাদপত্র এখন কেবল মুনাফা লোটার মাধ্যম। বড়ো, ছোটো বা মাঝারি ব্যবসার অংশ। তার কোনো 'মিশন' বা 'ভিশন' নেই। সময় পালটেছে। তার সঙ্গে পালটেছে সংবাদ বাছাই বা পরিবেশনের ধরন। তবে এই পালটে যাওয়া ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জলের মতো খোয়া গিয়েছে মূল্যবোধ। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপনে এখনকার সংবাদপত্র কেবল সেই সময়ের কিছু ঝলক ছাড়া অন্য কিছু যে তুলে ধরতে পারবে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সংবাদপত্র যে কেবল তথ্যের সমষ্টি নয়, তা ইতিহাসের দলিল, ৭৫ বছরের মধ্যে তা অনায়াসে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংবাদপত্র ঘিরে গড়ে ওঠে অনেক ধরনের ইতিহাস— সমাজের, ভাষার, আন্দোলনের, বিপ্লব ও বিদ্রোহের। সে যুগের সংবাদপত্রে উঠে আসত মানবিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্র। এখন কেবল সামাজিক কোঁদল, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও মানবিক অবক্ষয়ের ছবি আঁকা হয়। সংবাদজগতে একটি বহুল প্রচারিত বাক্য হলো 'জনগণ যা খায় আমরা তাই পরিবেশন করি।' অর্থাৎ মানুষ যে খবরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখনকার সংবাদ বিক্রয়কারীরা তেল ও সাবানের মতো তা খবরের হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে আসেন। সংবাদপত্র এখন আর আগের মতো ইতিহাস ধরে রাখার মাধ্যম নয়। তারা ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চান যাতে দৈনিক নতুন তথ্য তৈরি হয় আর পুরোনো ভুলে গিয়ে নতুন বাজার সৃষ্টি হয়। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব দেখিয়েছিল সংবাদপত্র কী সাংঘাতিক আলোড়নকারী ভূমিকা নিতে পারে। পরাধীন ভারতে একই ভূমিকা নিয়েছিল এখনকার সংবাদপত্র। জাতীয়তাবাদ আর জাতীয়তা বোধ তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকায় ছিল সংবাদপত্র। ১৮৫৭-র আগেই রামমোহন রায়ের 'সংবাদ কৌমুদি' বাঙ্গলার মানুষের চেতনা তৈরিতে ব্রতী হয়। পরবর্তীতে শুরু হয় ব্লিটজক্রিগ 'ঝটিকা' আক্রমণ— দিকদর্শন, সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকর, বেঙ্গল গেজেট, সোমপ্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী, প্রবাসী, ধুমকেতু, লাঙল, অমৃতবাজার আর বসুমতী সবাই মিলে সে আক্রমণ শানায়। লক্ষ্য 'ইংরেজ হটাও, দেশ বাঁচাও'। 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' এই স্লোগানে বঙ্গপ্রদেশের আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে। আর সে আওয়াজ পৌঁছে যায় সারা ভারতে। সংবাদপত্রের উপর নেমে আসে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের নির্মম কুঠার। বহু সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের মালিককে বিনা বিচারে আটক করে জেলে ভরা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এই অবস্থার সঙ্গে খানিকটা তুলনা চলে 'জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সি-র'। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন থেকে ১৬ মাসের জন্য সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ব্রিটিশ অত্যাচারীদের কায়দায় নিজের স্বার্থ বাঁচাতে টুটি টিপে ধরেন সংবাদপত্রের। ইদানীংকালে সরাসরি এ নজির না থাকলেও সংবাদপত্রের উপর নজরদারি বা তা আটকে দেওয়ার প্রবণতা সব সরকারের মধ্যেই থেকে গিয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী প্রেস সেনসর বা ছাঁটাই করেছিলেন। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি তালিকা থেকে সাতটি প্রথম শ্রেণীর কাগজকে বাদ দেন। পরে সে কাগজের বেশিরভাগ মালিক তাঁর সঙ্গে সবরকমের সমঝোতা করে নিয়ে এখন ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'সে রাম নেই, অযোধ্যাও নেই'। ব্রিটিশ ভারতে সংবাদপত্র ছিল 'অত্যাচারিত ভারতীয় জাতির মুখপত্র'। এটা দুঃখের এখন সেই সংবাদপত্র বা মাধ্যম কয়েকজন শিল্পপতি এবং তাদের গোষ্ঠীর তল্পিবাহক। এ অবক্ষয় লুকাব কোথায়? অগামীতে তা মুছে দেওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম। 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে' তার থেকে বড়ো 'উৎসব উপহার' আর কিছু নেই। □

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :-

ASHOKA TOOLS PVT. LTD.

MECHANICAL & STRUCTURAL ENGINEERS

email : ashokatools@hotmail.com

-: REGD. OFFICE :-

23A, Netaji Subhas Road,

11 th Floor, Room No. 31,

Kolkata-700 001

Phone No. 9331229004

-: FACTORY :-

Santra para, Par Dankuni

Hooghly, Pin- 712310

PHONE : OFFICE : 2231-9166/

PH. 9903853534

With the best Compliments from :

JALAN CHEMICAL & INDUSTRIES PVT. LTD.

Director : Rajesh Jain

27AB Royd Street, Ground Floor

Kolkata-700016

Phone : 22297263

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

পূর্ব মেদিনীপুরের অসহযোগ আন্দোলনের অসীম সাহসী নেতা

বলাইলাল দাস মহাপাত্র

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আহ্বানে প্রশিক্ষিত আন্দোলন সংগঠক ও সর্বাধিনায়ক বলাইদাস মহাপাত্র। তাঁর জন্ম ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অধুনা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার লালপুরে। ১৯২১ সালে যখন তিনি স্থানীয় বালিঘাই ধাওয়া এম.ই. স্কুলের ছাত্র, তখন অসহযোগ আন্দোলনে, আগুনে নিজের লাটিম মার্কা মহার্ঘ বিলাতি চাদর পুড়িয়ে দিয়ে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এরপর মানিকাবসানে দাশরথী পণ্ডার বাড়িতে গিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন এবং গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। কাঁথির জাতীয় বিদ্যালয়ে ১৯২১ সালে ভর্তি হন। ওই স্কুলে পড়ার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে পরিচালিত তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে ১৯২৬ সালে ভি. রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিচালিত জাতীয় কলেজ বিহার বিদ্যাপীঠে ভর্তি হন। সেখানেই তিনি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রেরিত সামরিক অফিসারের কাছে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ১৯৩১ সালে বিহার বিদ্যাপীঠের পড়া শেষ করে বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন বলাইলাল। কুমিল্লার অভয় আশ্রমের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনের ডাকে আন্দোলনে অংশ নেন তিনি। বিভিন্ন সময়ে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানের আন্দোলন সংগঠনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগনা থেকে বহিষ্কার করে মেদিনীপুরে অন্তরীণ রাখে। মেদিনীপুরে অবস্থানকালে কাঁথির বহিত্রকুণ্ডা গ্রামে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের নিয়ে কাঁথি মহকুমা সমর পরিষদ গঠিত হলে তাঁকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তথা মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর পুলিশি আক্রমণে আটজন ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

বলাইলাল মহাপাত্রকে গ্রেফতারের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৪ সালে হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এবং তার অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। শেষে ১৯৪৫-এ তিনি গ্রেফতার হয়ে এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৬-এ মুক্তি লাভের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরেন্দ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দেন বলাইলাল দাস মহাপাত্র।

ফ: ৭

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

বীণা দাস

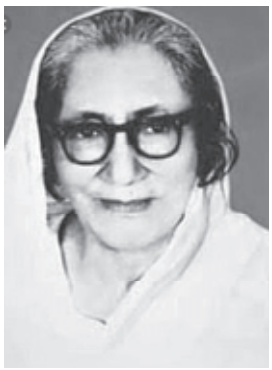

ননীবালা দেবী

ইতিহাসে উপেক্ষিতা অগ্নিকন্যা

সিদ্ধার্থ পাল

বীণা দাস ঃ ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী বীণা দাস। তাঁর পিতা ছিলেন বেণীমাধব দাস। যিনি একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ছাত্রদরদি শিক্ষক ছিলেন। আর বীণা দেবীর মা সরলা দেবী নিঃস্ব ও অসহায় মহিলাদের সাহায্যার্থে তৈরি করেছিলেন সরলা পুণ্যাশ্রম। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বেণীমাধব দাসের সাহচর্যে এসে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সমৃদ্ধ হন। নেতাজীর লেখা 'ভারত পথিক' বইয়ে তার উল্লেখ আছে। কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়াশুনা করেছেন বীণা দাস। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

বীণা দাসের পরিবার রাজনৈতিক পরিবার। অসহযোগ ও জাতীয় আন্দোলনের যোগ দেওয়ার কারণে তার দাদা কারাবরণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিমনস্ক হয়ে ওঠেন। সে সময় যুগান্তর দলের কতিপয় সদস্যের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বয়কট করার জন্য বীণা বেথুন কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। ১৯৩০ সালে ডালহৌসির অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ছোট ছোট দলের নেতৃত্ব দেন এবং গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেছিলেন তিনি। বীণা দাসের পিস্তলের গুলি থেকে জ্যাকসনকে রক্ষা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দি। ধরা পড়েন বীণা দাস। জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টায় নয় বছর কারাবরণ করেন বীণা দাস।

ননীবালা দেবী ঃ ননীবালা দেবী জন্মগ্রহণ করে ১৮৮৮ সালে হাওড়ার বালিতে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন এবং বাবার কাছে চলে আসেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি ঝুঁকতে থাকেন স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকে।

১৯১৫ সালে ননীবালা দেবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী হওয়ার দীক্ষা নেন। তাঁর কাজ ছিল বিপ্লবীদের রিষড়া ও চন্দননগরে ভাড়াবাড়িতে আশ্রয় দিয়ে রাখা। এছাড়াও রামচন্দ্র বাবুর স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে জেলবন্দি বিপ্লবীদের কাছ থেকে পিস্তলের খোঁজ নিয়ে আসা ছিল তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তিনি ১৯১৯ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন। তাঁর শেষ জীবন খুব কষ্টে কেটেছিল। শেষ জীবনে তাঁকে পুলিশের ভয়ে কেউ আশ্রয় দিতে চাননি। পঞ্চাশের দশকে তিনি সরকারের কাছে সাহায্য বলতে পেয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকা করে পেনশন। ননীবালা দেবী ছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা স্টেট প্রিজনার বা আসামী। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে সঠিক কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

আভা দে ঃ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আভা দে কোনো পুরুষের থেকে কম ছিলেন না। তিনি তাঁর সাহস ও শারীরিক শক্তির জোরে জীবনকে তুচ্ছ করে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সাঁতার কাটা থেকে শুরু করে দৌড়ানো, গাছে ওঠা, সাইকেল চালানো সবেতেই ছিলেন পারদর্শী। আভা দে তাঁর বন্ধু কল্যাণী দাসের সঙ্গে 'ছাত্রীসংঙ্ঘ'তে যোগদান করেছিলেন। সেসময় একবার ছাত্রীসংঘ থেকে সাইকেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি নাম দিয়ে কলকাতা থেকে বর্ধমান পর্যন্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি পথ সাইকেল চালিয়ে প্রথম হন।

আভা দে ১৯৩০ সালে নারী সত্যাগ্রহ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। একবার ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে বেআইনি শোভাযাত্রা ও সভায় যোগদান করার অপরাধে গ্রেপ্তার করে। তিনি প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন। আভা দের জন্মকাল, জন্মস্থান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে বলা হয়, সম্ভবত তিনি ১৯৩৮ সালে দেওঘরে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

দু'হাতে রিভলবার চালিয়ে পুলিশের জাল কেটেছিলেন অনন্ত সিংহ

রুদ্র মিত্র

পার্ক স্ট্রিট পোস্ট অফিসের সামনের রাস্তার ভিড়ে ব্যস্ততা। হঠাৎই কালো মাংকি ক্যাপ পরা কয়েকটা লোক হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল পোস্ট অফিসের ভিতরে। ঢুকেই জামার ভিতর থেকে বের করল রিভালবার। ওদের মধ্যে একজন চলে গেল পোস্টমাস্টারের কাছে। অন্যজন সোজা রিভলবার ধরল ক্যাশিয়ারের মাথায়। উপস্থিত সকলে আঁতকে উঠলেন। কেউ কেউ কেঁদে ফেললেন। যিনি ক্যাশিয়ারের মাথায় রিভলবার ধরেছিলেন এবার শোনা গেল তাঁর গুরুগম্ভীর গলা। সকলকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, 'কারো কোনও ক্ষতি হবে না। শুধু অপারেশনটা সাকসেসফুল হলেই চলবে।'

তিনি অনন্ত সিংহ। পড়াশোনার থেকে খেলাধুলা ও শরীরচর্চায় বেশি আগ্রহ ছিল ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে অনন্তর। চট্টগ্রামে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ার সময় নজরে আসেন সূর্য সেনের। তিনি বুঝেছিলেন, গড়ে নিলে ব্রিটিশদের ঘুম কেড়ে নেবে এই ছেলে। হয়েওছিল তাই। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন দিয়ে অনন্ত সিংহের রাজনৈতিক জীবন শুরু। তখন থেকেই মনে প্রাণে মানতেন শুধু প্রতিবাদ নয়, পালটা মার দিতে হবে। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে নামেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৩-এ।

১৮ এপ্রিল ১৯৩০। মাস্টারদার পরিকল্পনায় চট্টগ্রামে শুরু হলো বিদ্রোহ। শহরের সামরিক ঘাঁটিগুলোতে একসঙ্গে আক্রমণ করে একদল যুবক। অস্ত্রাগার লুঠ করে সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ফেণী স্টেশনে পুলিশের মুখোমুখি হন অনন্ত। দুই হাতে রিভলবার চালিয়ে পুলিশের জাল কেটে বেরিয়ে যান।

১৯৩৮ সাল। অনন্ত সিংহ তখন জেলে। সেইসময় একদিকে কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু, অন্যদিকে বাঙ্গলায় তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফজলুক হক-সুরাবর্দির শাসনকাল চলছে। পরিবেশ সম্পূর্ণ পক্ষে, এই চিন্তা করে অনন্ত সিংহ-সহ বন্দিরা মুক্তির জন্য অনশন করে ইংরেজ সরকারের উপর চাপ বাড়াবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন। খবর গেল গান্ধীজীর কাছে। সুভাষচন্দ্র বসু ও গান্ধীজী বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। গান্ধীজী কথা বললেন জেলের ভেতরে রাজবন্দিদের সঙ্গে। তাঁদের মুক্তির জন্য গান্ধীজী এক বছরের জন্য সময় চাইলেন। বন্দিরা প্রথমে রাজি না হলেও পরে এই প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু দিন গেল, মাস গেল, বন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে কোনও পদক্ষেপই নেওয়া হলো না। এইভাবে প্রায় এক বছর কেটে যায়। হতাশ বিপ্লবীরা মুক্তির জন্য আবার অনশন করার সিদ্ধান্ত নেন।

সুভাষচন্দ্র ও তাঁর মেজদা শরৎচন্দ্র বসু ছুটে গেলেন দমদম ও আলিপুর জেলে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে অনন্ত সিংহের কথা হল। অনন্ত সিংহের কথা, ''সুভাষবাবু খুব উৎকণ্ঠা নিয়ে হাতজোড় করে বারে বারে আমাদের বলেছিলেন, হয়তো এখনই ইংরেজ সরকার আপনাদের মুক্তি দেবে না, তবে মুক্তি খুব তাড়াতাড়ি হবেই। আমরা স্বাধীনতার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়ে, এবারে চরম আন্দোলন শুরু হবে। আপনারা অনশনের সিদ্ধান্ত নেবেন না, ভারত মায়ের পরবর্তী মুক্তি আন্দোলনে আপনাদের সকলকে দেশের প্রয়োজন।''

অতঃপর বিপ্লবীরা অনশন তুলে নেন। গান্ধীজী যা পারেননি সুভাষের অনুরোধে তা সম্ভব হয়। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় নেতাজীর বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের নেতা

মেজর সত্য গুপ্ত

সুভাষচন্দ্র বসুর বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সের মেজর সত্য গুপ্তর জন্ম ১৯০২ সালের ১৮ জুলাই ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার তেজগাঁওয়ে। পিতা প্যারীমোহন গুপ্ত। ১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন তিনি। দেশসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করার লক্ষ্যে আই এ পরীক্ষা দেওয়া হয়নি তাঁর।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন মেজর সত্য গুপ্ত। ১৯২৬-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাশ করেন। পরের বছর গুপ্ত বিপ্লবী দলের নির্দেশে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

১৯২৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে স্বাধীনতাকামী তরুণদের নিয়ে গঠিত হল বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স। সামগ্রিক নেতৃত্বে 'মেজর' হিসাবে থাকলেন সত্য গুপ্ত। সর্বাধিনায়ক বা 'জেনারেল অফিসার কমান্ডিং' পদে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু স্বয়ং। ১৯৩০ সালে ২৯ আগস্ট লোম্যান হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার হয়ে পরে মুক্তি পান মেজর সত্য। ১৯৩০-এর ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্ত কর্তৃক রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের ঘটনায় বন্দি হন।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত স্টেট প্রিজনাররূপে আলিপুর, বক্সার, মিনওয়ালি (পাঞ্জাব), যারবেদা (পুনা) জেলে কাটান তিনি। পরে হিজলি জেল থেকে মুক্তির পর সুভাষচন্দ্র বসুর একনিষ্ঠ সহকারীরূপে সমস্ত কাজের সঙ্গী হন। ১৯৪১-এর ১৬ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের মহানিষ্ক্রমণের পর, ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি বন্দি ছিলেন। মুক্তির পর বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগু গ্রামে সমাজ সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাগু সপ্তগ্রামের পল্লী নিকেতনের সভাপতি ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই পল্লী নিকেতনেই সম্পাদক ছিলেন আর এক বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন। মেজর সত্য গুপ্ত ১৯৬৬ সালের ১৯ জানুয়ারি প্রয়াত হন। □

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা সংগ্রামে মালদা জেলার অবদান

তরুণ কুমার পণ্ডিত

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙ্গলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হলেও মালদা জেলা ছিল শান্ত ও নিস্তরঙ্গ। ১৯০৭ সালে মালদার অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার কলকাতা থেকে মালদায় ফিরে এলেন দেশাত্মবোধের নতুন প্রেরণা নিয়ে। এখানে গড়ে তুললেন 'জাতীয় শিক্ষা সমিতি'। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সমাজে শিক্ষা বিস্তার করা। যার মাধ্যম ছিল অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, লাইব্রেরি ও গ্রন্থশালা স্থাপন করা, বালিকাদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করা ইত্যাদি। অধ্যাপক বিনয় সরকার ১৯০৭ সাল থেকেই গোটা মালদা জেলায় শিক্ষাবিস্তার ও স্বদেশপ্রেম ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খালি পায়ে, খালি গায়ে, একটি মাত্র সার মোটা কাপড় মোটা চাদর জড়িয়ে তিনি সে আমলে মালদা জেলার ১৫টি থানায় পায়ে হেঁটে ঘুরেছিলেন এবং জাতীয় শিক্ষার কথা জনে জনে বুঝিয়ে বলেছিলেন। উল্লেখ্য, তখনও ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব ঘটেনি বা খদ্দরের প্রচলন ছিল না। সেই সময় মালদা জেলার আধুনিক পথ ঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলই না, এককথায় মালদা ছিল দুর্গম। ওই সময়ে বিনয় সরকার-সহ বিপিন বিহারী ঘোষ, রাজেশ চন্দ্র শেখ, অমরেন্দ্রকৃষ্ণ ভাদুড়ী ও বলদেবানন্দ গিরি প্রমুখ শিক্ষাবিদরা বুঝেছিলেন যে, স্বাধীনতা লাভের জমি তৈরি করতে পারে একমাত্র জাতীয় শিক্ষা।

এবারে প্রথমেই যার নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন, অধুনা পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার স্বর্গত কৃষ্ণজীবন সান্যাল মহাশয়। পরবর্তীকালে যিনি মালদার জিলা স্কুলে ভর্তি হয়েও অল্প বয়সে বন্দে মাতরম্ বলার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন। বিখ্যাত আলিপুর মানিকতলা বোমার মামলাতে গ্রেপ্তার বরণ করে তিনি জেলাবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্র কুমার ঘোষের সংস্পর্শে আসার পর মাত্র ১৬ বছর বয়সে আলিপুর বোমার মামলায় ১০ বছরের কারবাসের সাজা ঘোষণা হয়। কিন্তু দু'বছর পরে কৃষ্ণজীবন সান্যাল মুক্তি পান। তাঁর সুযোগ্য পুত্র আইনজীবী বিমলকৃষ্ণ সান্যালের কাছ থেকে জানা যায়, ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মুরারিপুকুর বাগান ঘিরে ফেলে এবং

সেখানে উপস্থিত সমস্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে। খানা তল্লাশির সময়ে একটি স্যুটকেসে কৃষ্ণজীবন সান্যালের নাম লেখা একটি গীতা, বোমা তৈরি সম্বন্ধে একটি পুস্তক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র পাওয়া যায়। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের কানসাটের বানি থেকে তাকে গ্রেফতার করে। কৃষ্ণজীবন সান্যালের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষ চন্দ্র বসু একবার করে কানসাটে মৃত কৃষ্ণজীবন সান্যালের বাড়ি পরিদর্শন করেন এবং বাড়ির সামনে মিটিং করেন। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে কানসাটের কৃষ্ণজীবন সান্যালের এই বাড়িতে তিনি কিছুদিন আত্মগোপন করেছিলেন। দেশভাগের পর বর্তমানে মালদা শহরের একটি জনপথ কৃষ্ণজীবন সান্যালের নামে নামাঙ্কিত রয়েছে।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মালদা শহরে একজন তরুণ হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ডিসপেনসারি খুলে বসলেন। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর পসার ও জনপ্রিয়তা বাড়লো। সেই সময়ে মালদা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু ব্রিটিশ সরকারের চর হিসেবে কাজ করছিলেন। বহু তরুণের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তাদের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। বিপ্লবীদের কাছে এখবর ছিল। নবীনবাবুর ওই চরবৃত্তি মালদার বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালানোর পক্ষে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই তাঁর মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়ে গিয়েছিল এবং তা কার্যকর করার দায়িত্ব নিয়েছিলন অগ্রগামী বিপ্লবীরা। ১৯১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি নবীনবাবু তাঁর প্রাত্যহিক বৈকালিক ভ্রমণ সেরে আজকের জেলা স্কুলের মাঠ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। পথের একটি কাঠবাদামের গাছের কাছে তিনি হঠাৎ আক্রান্ত ও নিহত হলেন। সেই সময়ে গাজোল থানার আলাল গ্রামের জমিদার পুত্র মহেন্দ্র নাথ দাসও বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি রক্তাক্ত নবীনবাবুর লাশ দেখে হঠাৎ ভয় পেয়ে দৌড়াতে লাগলেন আর তখনই এক পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। সারা শহরে ও জেলায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। প্রধান শিক্ষক নবীনবাবুকে হত্যা সন্দেহে মহেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ ও আন্দামানে নির্বাসন হয়ে গেল। এদিকে নবীনবাবু নিহত হওয়ার পর থেকে সেই হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে বিপ্লবী নেতা সতীশ চন্দ্র পাকড়াশীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় যে, সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছিলেন একজন বিপ্লবী যার নাম নগেন দাস এবং তিনিই নবীনবাবুকে হত্যা করেছিলেন।

অবিভক্ত মালদা জেলার গোমস্তাপুর থানার মেহেরপুর গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের সন্তান প্রিয়নাথ ঘোষ অসহযোগ আন্দোলনের আর একজন সৈনিক। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে গ্রেফতার হন। দীর্ঘ বন্দি জীবন কাটান বাঙ্গলার নানান জেলে। হিজলি জেলে গেলে সেখানেই অগ্রজ প্রতিম বিপ্লবী পুরাতন মালদার হংসগোপাল আগরওয়ালার সঙ্গে বহুদিন পরে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। পুরাতন মালদার অন্তর্গত সর্ববরী গ্রামে হংসগোপালের জন্ম। তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন ও অল্প বয়সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হংসগোপাল অত্যন্ত সুচতুর ও দুঃসাহসী ছিলেন। রাজশাহীতে নবম শ্রেণীতে পড়ার সময় চট্টগ্রামে পালিয়ে যান। সেখানে এন্ট্রান্স ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার সময় লক্ষ্য করেন পুলিশ তাঁর খোঁজ করছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতঘড়ি ও কলম ডেস্কে রেখে প্রস্রাব করার নাম করে উধাও হয়ে যান। সেই গেলেন আর পরীক্ষা দিতে আসেননি। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কর্মজীবনে তাঁকে অনেকবার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। মালদা, রাজশাহী, শান্তিপুর, বহরমপুর প্রভৃতি জেলে তিনি বন্দি জীবন যাপন করেছেন। আবার ছাড়া পেলেই বিপ্লবী জীবনে ফিরে যেতেন। ছদ্মবেশ ধারণ করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অনেকবার তাঁকে পালাতে দেখা গেছে। ১৯৩৮ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হংসগোপাল বাড়ি ফেরেন। তিনি মোট ১৯ বছর জেল ও ২৮ মাস পলাতক জীবন কাটিয়েছিলেন।

অতুল চন্দ্র কুমার ছিলেন মালদা জেলার কংগ্রেসের একচ্ছত্র নেতা। আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩২ সালেও গান্ধীজীর নির্দেশে তিনি আইন অমান্য করেন ও কারাবরণ করেন। একবছর জেলে কাটান। ১৯৩৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি কংগ্রেসের প্রার্থীরূপে যোগ দেন ও বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হন। ১৯৩৯ সালে অতুল কুমারের আমন্ত্রণেই তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু মালদায় এসেছিলেন। ১৯৪০ সালের ১৩ ডিসেম্বর সুভাষচন্দ্র বসু একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন ফণী মজুমদারের হাতে অতুলচন্দ্র কুমারকে দেওয়ার জন্য। সেই চিঠিতে সুভাষচন্দ্র বিশেষ প্রয়োজনে অতুলবাবুকে অবিলম্বে মালদা থেকে কলকাতায় চলে আসার কথা লিখেছিলেন। অতুল চন্দ্র কুমার সুভাষ চন্দ্র বসুর এতটাই বিশ্বাসভাজন ছিলেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের গোপন সংবাদ আদান-প্রদান করতে তিনি অতুলবাবুর উপর নির্ভর করেছিলেন। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর ভারত ত্যাগের পর ১৯৪২ সালে এ. কে. ফজলুল হক ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রগতিশীল কোয়ালিশন দল গঠিত হলে অতুলচন্দ্র সেই দলের চিফ হুইপ নির্বাচিত হন। এইসময় অতুলচন্দ্র কবি নজরুল ইসলামের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবীও স্বামীর মতো দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৬৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর এই স্বাধীনতা সংগ্রামী পরলোকগমন করেন।

মালদার আর এক সুসন্তান গিরিজা মুখার্জী অসহযোগে শামিল হন। কিন্তু সুকৌশলে গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। মালদা জেলা স্কুলের ছাত্র ও পরে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালের পরে সবার চোখে ধুলো দিয়ে তিনি বিলেতে পাড়ি দেন এবং সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯৩১ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত গোলটেবিল

বৈঠকে তিনি বিলেতে গান্ধীজীর দলের সঙ্গে এক সারিতে বসেন। পরে জার্মানিতে পারি জমান ও সেখান থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে থাকেন। ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু বার্লিনে গেলে গিরিজা মুখার্জী তাঁর সঙ্গে হিটলারের দেখা করিয়ে দেন।

বলদেবানন্দ গিরি ছিলেন মালদার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রথম সারির অমিতবিক্রম যোদ্ধা। তাঁর জন্য তিনি বহুবার নানা লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। তবু তিনি সাহস হারাননি। তাঁর যেমন তেজ বীর্য ছিল, তেমনি ছিল অসীম সংগঠন শক্তি। তাঁর সঙ্গীসাথীরা তার সাহসেই সাহস পেতেন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে সংগঠন মজবুত ও শক্তিশালী হয়েছিল। 'মহাকালী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি নারীশিক্ষা প্রসারে তাঁর দান ও সেবা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে তাঁর নামে মালদা শহরের একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে।

মালদায় গুপ্তভাবে কর্মরত বিপ্লবীদের মধ্যে আরও যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন, নরোত্তম রায়, হরিনারায়ণ দাস, মণীন্দ্র নাথ গোস্বামী, ভগবান বসাক, দ্বারিকা দাস বিহানী, ফণী গোস্বামী প্রমুখ।

পাঁচকড়ি দাস ওরফে পাঁচু, বাড়ি মালদা শহরের মকদমপুরে। ১৯৩২ সালের কথা। কলেজ পাশ করেই পাঁচু বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি রাজবন্দি হন। পরে ১৯৩৭ সালে, তখন আবার দেখা যায় তিনি গৃহবন্দি রয়েছেন। একদিন খুব ভোরে উঠে স্থানীয় মানুষেরা দেখে প্রচুর লালপাগড়ি পরা পুলিশ পাঁচুর বাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলেছে। সূর্য উঠতে তখনও কিছুটা দেরি আছে। দেখা গেল একটি শাড়ি পরা মেয়ে কলসী নিয়ে পুলিশের সামনে দিয়েই ঘোমটা টেনে সোজা মহানন্দা নদীর দিকে চলে গেল আর তারপরেই পগারপার। পাঁচু এভাবেই পালিয়েছিলেন। পুলিশ হতভম্ব। এভাবে বেশ কয়েকবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাকে পালাতে দেখা গেছে।

শান্তি গোপাল সেন মালদার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তালিকায় বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। চট্টগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ও তারপর মালদা জেলা স্কুলের ছাত্র শান্তি গোপাল ছোটোবেলায় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের গান শুনে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হন। বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তার বিরুদ্ধে ইংরেজ সাহেবদের হত্যার অভিযোগ ওঠে। কিছুদিন পলাতক জীবন ও মেদিনীপুরের বার্জ হত্যা মামলায় দীর্ঘমেয়াদি বন্দি জীবন কাটিয়ে ইনি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। তাঁর ঘটনাবহুল বিপ্লবী জীবন অল্প কথায় বলা যায় না।

পরিশেষে মালদা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামে জিতু সাঁওতালের কথা না বললে রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১৯২৬ সালের দিকে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে জিতুর লড়াই শুরু হয়। ১৯৩০ সালে জিতু সবরকম সরকারি খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেবার আদেশ জারি করেন ও বলেন যে, তাঁর এলাকায় ব্রিটিশ রাজত্ব শেষ হয়েছে। ব্রিটিশদের দমন পীড়ন আরও তীব্র হলে জিতু মহিলা, পুরুষ, শিশু এবং তার দলবল সঙ্গে নিয়ে আদিনা মসজিদে জড়ো হয়। মুসলমান জমিদাররা প্রচার করে দেন যে হিন্দু জিতু আদিনা মসজিদকে মন্দির বানাতে চায়। এদিকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও ব্রিটিশ পুলিশ সাঁওতালদের বিদ্রোহের খবর পেয়ে সশস্ত্র বাহিনী ও জোতদারদের নিয়ে যুদ্ধে রওনা হলেন। তির ধনুক ও বন্দুকের অসম লড়াই শুরু হয়। সরকার পক্ষে একজন সশস্ত্র পুলিশ সংঘর্ষে মারা যাওয়ার পর ডিএম ও এসপি উদ্বিগ্ন হয়ে শান্তির বার্তা দিলেন কিন্তু জিতুর সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার নামে বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ সরকারের পদলেহী জনৈক জমিদার অতর্কিত গুলি ছোড়ে । জিতুর ছোট ভাই অর্জুনের ডান হাত গুলিতে উড়ে যায়। এই অর্জুন সর্দার হিন্দু মহাসভার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। লড়াইয়ে জিতু-সহ বহু সাঁওতাল গুলিবিদ্ধ হয়ে হতাহত হয়। এছাড়াও জেলার হরিনন্দন ব্রহ্মচারী, দেবেন ঝা, মহিলাদের মধ্যে সুধারানি মিশ্র, তরুবালা সেন, কালীরঞ্জন রায়, দিগীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, সূর্যকান্ত দে প্রমুখ স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বদেশ প্রেমের পবিত্র আগুনে নিজেদের জীবনকে শুদ্ধ করেছিলেন। □

With Best

Compliments
From

Punjab Glass Depot

OMEX (INDIA) SALES PVT. LTD.

Earth Moving, Mining, Auto &
General Machinery Spares

6, Mangoe Lane, 2nd Floor,
Kolkata - 700 001

Phone : 2210-3267, 2248-0761

Fax : 22102969,

E-mail : omexindi@cal2.vsnl.net.in

With Best Compliments From :-

Hommage Commercial
Private Limited

M. E. M. INDUSTRIES

AN ISO 9001 : 2015 Company

e-mail : cables@memindustries.com
Poddar Court, Gate no. 4, 2nd floor,
18, Rabindra Sanani,
Kolkata-700 001,
Phone : 22357998, 22352996,
Mob. : 9830120020

OUR RANGE

- Compensating Cables
- High Temperature Cables
- Instrumentation Cables
- Trailing Rubber Cables
- Control & Frls Cables
- Thermocouples & RTD

**Also Sole Distributor
BELDEN (USA)Cables.**

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য...

সাহিত্যেও অসামান্য ছাপ রেখে গেছেন

বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিপ্লবী ও লেখক নিকুঞ্জ সেনের। ১৯০৫ সালে ঢাকার ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ স্থাপিত বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি যুগান্তর দলের 'মুক্তি সঙ্ঘে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুর 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স'-এর সদস্য হন। কুমিল্লায় ললিত বর্মনের নেতৃত্বে দলকে শক্তিশালী করার উদ্দেশে রওনা হন। তাঁর ও ললিত বর্মনের বিপ্লবী প্রচেষ্টার ফল হিসাবে পেলেন কুমিল্লার ফয়জুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের দুই সহপাঠী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরীকে। এঁরাই কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্টিভেন্সকে ১৯৩১-এর ১৪ ডিসেম্বর হত্যা করেন। নিকুঞ্জ সেন শিক্ষকতার মাধ্যমে দল ও সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ঢাকার বিক্রমপুরের বানারিপাড়া স্কুলে যোগ দিলেন। ছাত্র হিসাবে পেলেন বাদল গুপ্তকে। তাঁর আসল নাম ছিল সুধীর গুপ্ত। বাদলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন নিকুঞ্জ সেন। বাদলও বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্সে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে যোগ দেন। বিপ্লবী হেমন্ত ঘোষের অপর সহযোগী বিনয় বসু (১৯০৮-১৯৩০) ডাক্তারি পড়াশোনা ছেড়ে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে এসে, সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঢাকায় বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের শাখা গড়ে তোলেন। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল এন. এস সিম্পসন। বন্দিদের উপর অত্যাচার চালানোর জন্য সিম্পসন বিপ্লবীদের কাছে কুখ্যাত ছিলেন। সিম্পসনকে হত্যার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টির জন্য অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। সিম্পসনকে হত্যা করা হবে তার অফিসে। তদানীন্তন সচিবালয়ে। সেইমতো কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন বিনয় বসু। সহযোগী ছিলেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত একজোটে সাহেবি বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে রাইটার্স ভবনে প্রবেশ করেন ও সিম্পসনকে গুলি করে হত্যা করেন। নিকুঞ্জ সেন শুধু এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন না, এই অভিযানের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই অভিযানের পর তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। পরে ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হয়ে ৭ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে আবার গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৪৬-এ মুক্তি পান। এই সময় সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের কাজে যুক্ত হন। সুবক্তা নিকুঞ্জ সেন সাহিত্যেও অসামান্য ছাপ রেখে গেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'জেলখানা কারাগার', 'বক্সার পর দেউলিয়া', 'ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা'। ১৯৮৬ সালের ২ জুলাই বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের মৃত্যু হয়। □

ফ: ৮

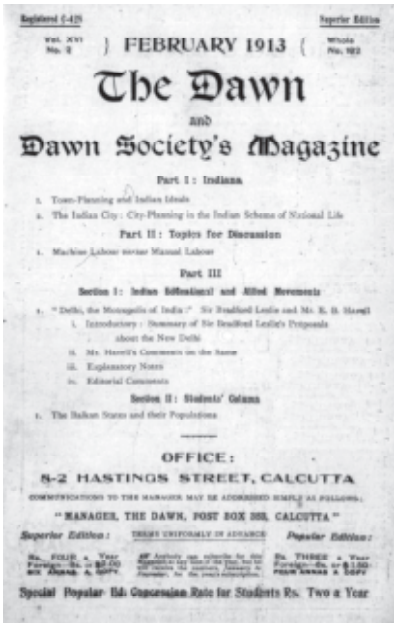

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

Registered C-425 Superior Edition

Vol. XVI No. 2 } FEBRUARY 1913 { Whole No. 182

The Dawn

and

Dawn Society's Magazine

Part I : Indiana

1. Town-Planning and Indian Ideals
2. The Indian City : City-Planning in the Indian Scheme of National Life

Part II : Topics for Discussion

1. Machine Labour versus Manual Labour

Part III

Section I : Indian Educational and Allied Movements

1. "Delhi, the Metropolis of India :" Sir Bradford Leslie and Mr. E. B. Havell
   i. Introductory : Summary of Sir Bradford Leslie's Proposals about the New Delhi
   ii. Mr. Havell's Comments on the Same
   iii. Explanatory Notes
   iv. Editorial Comments

Section II : Students' Column

1. The Balkan States and their Populations

OFFICE :

8-2 HASTINGS STREET, CALCUTTA

COMMUNICATIONS TO THE MANAGER MAY BE ADDRESSED SIMPLY AS FOLLOWS :

"MANAGER, THE DAWN, POST BOX 388, CALCUTTA."

Superior Edition : TERMS UNIFORMLY IN ADVANCE Popular Edition :

Special Popular Ed. Concession Rate for Students Rs. Two a Year

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি গড়ে দিয়েছিল হিন্দু মেলা

অভিমন্যু গুহ

ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে দেশজুড়ে 'অমৃত মহোৎসব' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। আমাদের মনে রাখা দরকার এই স্বাধীনতা কেবল দুশো বছরের ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তি বই আর কিছু নয়। কিন্তু আমাদের অতীত ভারতভূমির পরাধীনতা আরও আটশো বছরের পুরনো, মুসলমান শাসনের হাত থেকে মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকা বিবেচিত হবে। একথা সবার জানা, বণিকের বেশে ব্রিটিশদের এদেশে প্রবেশ, তারপর ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছলে-বলে-কৌশলে এদেশের শাসন ক্ষমতায় কায়েম করে বসা। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী একশো বছর (১৭৫৭—১৮৫৭) ব্রিটিশদের শাসনে দেখা যায়, একদিকে যেমন শাসকদের বণিকবৃত্তির জন্য এদেশের জনসাধারণ অত্যাচারিত হচ্ছিলেন, অন্যদিকে এই সুযোগে অত্যাচারিত জনগণের প্রতি দরদ দেখিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা এদেশে জাঁকিয়ে বসেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছিল শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন। এদেশীয় জনসাধারণকে তথাকথিত 'শিক্ষিত' করতে চেয়ে ভারতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই মিশনারিদের মধ্যে যে দু'একজন সত্যিকারের ভারত-দরদি ছিলেন যেমন ডেভিড হেয়ার —তাঁদের সংখ্যা নেহাতই হাতে গোনা।

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে একেবারেই হয়নি এরও দুরকম চরিত্র ছিল। প্রথমত, শাসন-ক্ষমতা হারানোর দুঃখ মুসলমানরা ভুলতে পারছিল না। তাই ব্রিটিশদের সঙ্গে তারা বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংঘর্ষে জড়িয়েছিল, পুনরায় ভারতবর্ষে তাদের শাসনক্ষমতা কায়েমের লক্ষ্যে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বেরিলির সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে আরবজাত ওয়াহাবি আন্দোলন, বাঙ্গলায় এই আন্দোলনের ফসল হলো তিতুমির। সেই সময় হিন্দুরাও কিছুক্ষেত্রে বিদ্রোহী হয়েছিল। তাদের লড়াইটা ছিল ব্রিটিশ ও মুসলমান, উভয়ের বিরুদ্ধে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে বিদ্রোহ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা করেছিলেন এবং আমরা স্বদেশী মন্ত্র 'বন্দেমাতরমে'র পরিচয়ও সেই উপন্যাসেই লাভ করেছিলাম। সেই অর্থে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কাঁপানো প্রথম বিদ্রোহ অবশ্যই ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ যা আসলে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ হলেও তার রেশ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল ও দেশের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয় ব্রিটেনের মহারানির প্রশাসনের হাতে।

দেশের খণ্ডিত স্বাধীনতা প্রাপ্তি তার নব্বই বছর বাদে। ভারতে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয় ১৮৯৭ সালে, মহারাষ্ট্রে চাপেকর ভাইদের আত্মবলিদানের মাধ্যমে। অচিরেই তার রেশ এসে পড়ে বাঙ্গলায়। শুরুটা হয়েছিল নিখাদ স্বদেশী আন্দোলন 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে'র মধ্য দিয়ে স্বদেশী পণ্য গ্রহণ ও বিদেশি পণ্য বর্জনের মাধ্যমে। স্বদেশী শিক্ষাও এই পর্যায়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশদের শিক্ষায় শিক্ষিত করার কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলদিঘির গোলামখানা আখ্যা দিয়ে স্বদেশী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ন্যাশানাল কলেজ স্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অচিরেই বিপ্লবী আন্দোলনের ছোঁয়া লাগলো। ১৯০৮ সালে মজফ্‌ফরপুরের অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে আত্মবলিদান দিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী। স্বদেশী আন্দোলনের রক্তক্ষয়ী পথচলা শুরু হলো। এরপর চার দশকের ক্রমাগত সংগ্রাম আর বহু কিশোর, যুবক, তরুণের প্রাণের বিনিময়ে বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এল, কিছু রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীর দৌলতে সেই স্বাধীনতা খণ্ডিত হলেও, বিপ্লবীদের দেশের জন্য আত্মবলিদান চিরকাল ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এর ক্ষেত্র কিন্তু প্রস্তুত হয়েছিল বিপ্লবী আন্দোলন এদেশে দেখা দেওয়ার ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেই।

১৮৬১ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু যে মুহূর্তে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা'র সূচনা করলেন সেদিন থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল ক্ষেত্র। অবশ্য এর আগেও স্থাপিত বাঙ্গলায় জাতীয়-জাগরণে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। যেমন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পৌরোহিত্যে 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ', দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে দেশহিতার্থী সভা, রাধাকান্ত দেবের সভাপতিত্বে 'ভারত মহাসভা' ইত্যাদি। কিন্তু মেদিনীপুরের বুকে রাজনারায়ণ বসু স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার

যে যজ্ঞ শুরু করলেন তাই শেষপর্যন্ত অটুট থাকলো। এই সভার অনুষ্ঠানপত্র দেখে নবগোপাল মিত্রের ইচ্ছা জাগল একটি স্বদেশী মেলার সূচনা করবেন। তাঁর উদ্যোগেই ১২৭৩ বঙ্গাব্দের (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের) চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে শুরু হলো একটি স্বদেশী মেলা—চৈত্র মেলা। মেলার উদ্দেশ্য হিসেবে স্পষ্ট ঘোষিত হলো—হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা ও ভারতবাসীকে 'আত্মনির্ভর' করে গড়ে তোলা। অচিরেই তাই মেলাটি 'হিন্দুমেলা' নামে পরিচিত হলো। এবং ১৮৭০ সাল থেকে সচরাচর মেলাটি মাঘ-সংক্রান্তি ও তারপর দুদিন ধরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। মেলার সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্পষ্টই ঘোষণা করলেন, 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোনও বিষয় সুখের জন্য নহে, কোনও আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারতভূমির জন্য'। ব্রিটিশ শাসনে জাতীয়-চেতনা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিল, কিন্তু স্বদেশের নাম সোচ্চারে ঘোষিত হলো ব্রিটিশ শাসনাধীনে এই প্রথমবার হিন্দুমেলায়। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়'। নবগোপাল মিত্র ছাড়াও এই হিন্দুমেলার উৎসাহী কর্মকর্তা ছিলেন মনোমোহন বসু, সীতারাম ঘোষ, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। আর পরামর্শদাতার ভূমিকায় ছিলেন, রাজা কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ।

তবে বৎসরান্তে একবার মেলা করেই হিন্দুমেলার কর্মকর্তাদের জাতীয়তাবোধ পরিতৃপ্ত হয়নি। হিন্দুমেলার অধ্যক্ষতা করার জন্য 'জাতীয় সভা' স্থাপিত হয়েছিল। জাতীয় সভায় তৎকালীন সময়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বহু বক্তব্য রাখেন। স্বদেশী শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছিল 'ন্যাশনাল স্কুল'। ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াইয়ে বাঙ্গালির শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন নবগোপাল মিত্র। তাই তিনি বহু জায়গায় 'ন্যাশানাল জিমন্যাসিয়াম' প্রতিষ্ঠা করেন। ব্যায়াম-চর্চায় তাঁর এই উদ্যমের কারণে তিনি 'শারীরিক চর্চার পথিকৃতে'র মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এর পরবর্তী পর্যায়ে এরই ক্রমোন্নতিতে 'ন্যাশানাল সার্কাসে'র প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। এই জাতীয়তার কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য নবগোপাল মিত্র 'ন্যাশানাল নবগোপাল' অভিধায় ভূষিত হন। মেলায় অনেকগুলি স্বদেশী সংগীত রচিত হয়েছিল, যেগুলি তৎকালীন সময়ে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পেয়েছিল, কারণ তাতে দেশের নাম উল্লেখ করে দেশের প্রতি অনুরাগ স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়। যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সব ভারতসন্তান', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী জাগো জাগো ভারত সন্তান' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে 'হিন্দুমেলার উপহার' শীর্ষক একটি জাতীয় প্রেমোদ্দীপক কবিতা রচনা করেন হিন্দুমেলাকে উপলক্ষ্য করে। মেলায় স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের প্রদর্শনী হতো, যাতে গ্রাম-বাঙ্গলার জনসাধারণের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার ছিল। এতে স্বদেশী অর্থনীতিরও নিশ্চয়ই উপকার সাধন হয়েছিল।

মেলাটির অস্তিত্ব ছিল ১৮৮০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু মাত্র চোদ্দ বছরের এই স্বল্পসময়ের মধ্যে পরাধীন দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তার প্রেরণা জুগিয়ে দেশকে তা স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথ দেখিয়েছিল। হিন্দুমেলার সঙ্গে ভারতবাসীর মনে জাতীয় জাগরণে যে দুটি প্রতিষ্ঠান সবসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, সেগুলি হলো ১৮৭৫ সালে শিশির কুমার ঘোষ ও শম্ভুচরণ মুখার্জি স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান লিগ' এবং ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু স্থাপিত 'ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন'। পরবর্তীকালে রাজনারায়ণ বসু দেওঘর বাসকালে 'জাতিত্বের উপাদান ও বাঙ্গালি জাতি' এবং 'মহাহিন্দু সংগঠনে'র প্রস্তাবনায় 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' রচনা করে ভারতবাসীর জাতীয়তা-চেতনাকে সংহত করেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে অবনীন্দ্রনাথ দেশমাতৃকার রূপকল্প নির্মাণ করেছিলেন 'বঙ্গমাতা' চিত্রের মাধ্যমে। নিবেদিতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় সেই চিত্রের পরিচিতি লিখতে গিয়ে বঙ্গমাতাকে 'ভারতমাতা' হিসেবে প্রতিপন্ন করেন। বাঙ্গালি মনীষীদের জাতীয়তাবোধের যাত্রা এভাবেই বাঙ্গালির আঞ্চলিকতার ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করে এভাবেই সারাদেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়লো।

সখারাম গণেশ দেউস্কর 'জাতীয়তাবাদ' প্রসঙ্গে বলেছেন, অতীতে দেশ-শাসনকারী হিন্দুরাজারা প্রজাপালক ছিলেন, তাই তখন জাতীয়তাবোধের ততটা প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রজা-নিপীড়নকারী ব্রিটিশ শাসনে এই জাতীয়তাবোধের আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। আর একথাও অনস্বীকার্য যে, আমাদের জাতীয়তাবোধ মুক্তি-আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। একথা ঠিক, স্বাধীনতা আন্দোলনের আপেক্ষিকতা রয়েছে। স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের যে প্রয়োজনীয়তা ছিল, স্বাধীনোত্তর ভারতে সেই প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিবর্তনীয়, আগেও তার গুরুত্ব যেমন ছিল, এখনও তেমন আছে। □

রাজনারায়ণ বসু

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবগোপাল মিত্র

শিশির চন্দ্র ঘোষ

স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তরবঙ্গের অবদান

সাধন কুমার পাল

'বিপ্লবী জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন উত্তরবঙ্গে বিপ্লবীদের অনেকগুলি দল একযোগে কাজ করত। কুচবিহারের ওই বিপ্লবী দলগুলির বেশকিছু শাখা ছিল। এমনকী মাথাভাঙ্গার মতো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও দলের কার্যালয় ছিল।

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম রূপকার ছিলেন কাশীমোহন ঘোষ। ১৯০৫ সালে তিনি ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তিনি পড়া ছেড়ে অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির মাধ্যমে স্বদেশী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কোচবিহারে কিছু 'আখড়া' তৈরি হয়েছিল। সেখানে যুবকরা লাঠিখেলা ছোরা চালানো শিখতো। রাজপরিবারের গৃহশিক্ষক অংশুমান দাশগুপ্ত ছাত্রাবস্থায় কোচবিহারের নতুন বাজারে এরকম একটি আখড়ায় যেতেন।

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার মাথাভাঙ্গার একটি ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন, মাথাভাঙ্গা হাই স্কুলের হেডমাস্টারের ছেলে কলকাতায় কোনও এক ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হলে হেডমাস্টারের বাড়িতে ইংরেজের পুলিশ কোচবিহার রাজ্যের পুলিশের সহায়তায় তল্লাশি চালিয়েছিল। এখানে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়িতে পাওয়া ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবনচরিত এবং রজনীকান্ত গুপ্তের 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' পুলিশ পুড়িয়ে ফেলেছিল। বিশিষ্ট জননেতা উপেন্দ্রনাথ বর্মন তাঁর 'উত্তর বাঙ্গলার সেকাল ও আমার জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'স্কুলের ছাত্রাবস্থায় আমার জীবনে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। কুচবিহার নেটিভ স্টেট। মহারাজা স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী ছিলেন, সেজন্য প্রকাশ্যভাবে আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু গোপনভাবে অনুশীলন সমিতির আন্দোলন মাথাভাঙা শহরের বিস্তার লাভ করেছিল। যখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমিও ক্রমে অনুশীলন সমিতির সভ্য হইলাম।'

বিভিন্ন লেখা থেকে এরকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাবে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কোচবিহার জেলার বিশিষ্ট স্থান ছিল। প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গটি কৈবর্ত বিদ্রোহ, সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের পথ ধরে উত্তরবঙ্গ ভূখণ্ডেই প্রথম বিচ্ছুরিত হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল এই ভূখণ্ডের রংপুর (জলপাইগুড়ি-সহ), দিনাজপুর ও তরাই অঞ্চলে। ১৭৬০ সালে সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত এই প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। ১৭৭১ সালে সন্ন্যাসী-ফকিরদের

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ বিদ্রোহে পরিবর্তিত হয়েছিল। এই বিদ্রোহই চিত্রিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে। দেশপ্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বন্দেমাতরমের সৃষ্টির পিছনে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছিল সন্ন্যাসীদের ত্যাগ ও দেশপ্রেম।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম যে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল, তাও উত্তরবঙ্গের রংপুর (জলপাইগুড়ি-সহ), দিনাজপুর অঞ্চলেই ঘটেছিল। ১৭৮৩ সালের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ ইতিহাসে কৃষক অভ্যুত্থান নামে পরিচিতি পেয়েছে। এটি কোম্পানির বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ ।

বর্তমান উত্তরবঙ্গের মধ্যে জলপাইগুড়িতেই সভা-সমিতি গঠন ও পুরসভা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক চেতনার প্রসারণের সূচনা হয়েছিল। আবার সশস্ত্র সংগ্রামও এই জেলাতেই শুরু হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের প্রথম রাজনৈতিক শহিদ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। ১৯১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ভিতর সিআইডির ডেপুটি সুপারিনটেডেন্ট কুখ্যাত পুলিশ অফিসার শ্যামসুল আলমকে হত্যার অভিযোগে বীরেন্দ্রনাথের ফাঁসি হয়। এই বিপ্লবীর মর্মরমূর্তি জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের চত্বরে দেখা যাবে। কেতু বসু বা কালকেতু ছিলেন উত্তরবঙ্গের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী।

দার্জিলিঙের দলবাহাদুর গিরির পরিবারের সকলেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দলবাহাদুর গিরির দাদা কবি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী অগম সিং গিরি ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন গোর্খা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। দলবাহাদুরের ছোটভাই রামচন্দ্র গিরি ও লক্ষ্মণ গিরি সুভাষচন্দ্র পরিচালিত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। দলবাহাদুর গিরির অক্লান্ত পরিশ্রমেই দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল উত্তরবঙ্গ। দিনাজপুরের হিলি মেলে ডাকাতি, দার্জিলিঙের লেবং রেসকোর্সে গভর্নর হত্যার চেষ্টা, মালদহের জিতু সাঁওতালের গণবিদ্রোহ, জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স চা-বাগানে টানা ভগত আন্দোলন এবং গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলন উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

দার্জিলিঙে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের প্রধান সংগঠক বাঘা যতীন। চারু দত্ত দার্জিলিঙে বাঙ্গলার গভর্নর অ্যান্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। ১৯৩৪ সালের ৮ মে ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিঙে বাঙ্গলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। বিচারে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির হুকুম হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

দলবাহাদুর গিরি

অপরাজিতা গোপ্পী

ভবানী ভট্টাচার্য

বালুরঘাটের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো ধীরেন ব্যানার্জী। ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের আগেই ১৯৪১-এর নভেম্বর তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনি দিনাজপুর, হিজলী, ঢাকা ও বক্সা বন্দিশিবিরে বন্দি জীবনযাপন করেন। ১৯৪২ এর ১৪ সেপ্টেম্বর সরোজ চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে বিশ্বরঞ্জন সেন, পুলিন দাশগুপ্ত, রাধামোহন মহন্ত প্রমুখ বিপ্লবীর নেতৃত্বে প্রায় ১২ হাজার জনতার এক বিরাট মিছিল বালুরঘাট ট্রেজারিতে জমায়েত হয়। ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে সমবেত মানুষ স্বাধীন ভারতের স্লোগান দিতে থাকে। বালুরঘাট তিনদিনেরও বেশি স্বাধীন ছিল। সেই সময় ইংরেজ শাসনের কোনো অস্তিত্ব বালুরঘাটে ছিল না। ৪২-এর আন্দোলনে দিনাজপুরের মানুষের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয়।

উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহিলারাও পিছিয়ে ছিলেন না। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের অনেক বাড়িতে চরকায় সুতো কাটা হতো। সুহাসিনী গোস্বামী, সরোজিনী গুহ, বিমলা সুধা সিদ্ধান্ত প্রমুখের নেতৃত্বে রায়গঞ্জের বড়বাসাতে তাঁত বসানো হয়। মা-বোনেদের অনেকেই সেই তাঁতে কাপড় বুনে স্বদেশিদের দান করতেন, নিজেরাও পরতেন। জলপাইগুড়ি শহরের মহেন্দ্রবালা দেবী, বীণা চৌধুরী, সরযূ সরকার, বীণা ভৌমিক, উমা দাশগুপ্ত প্রমুখ ব্রিটিশ বিরোধী ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুভাষিণী ঘোষ। সেদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের কাছে সুভাষিণী ঘোষ ছিলেন মায়ের মতো। লীলা সেন, তারা বন্দোপাধ্যায়, বিভা দত্ত, উমা দাশগুপ্ত, কল্পনা নিয়োগী প্রমুখ জলপাইগুড়িতে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন।

বিপ্লবী বীণা দাশগুপ্ত দার্জিলিঙে তদানীন্তন ভাইসরয়কে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন। অপরাজিতা গোপ্পীর নেতৃত্বে কোচবিহারে শুরু হয়েছিল ব্যাপক ছাত্রী ধর্মঘট। চিরস্মরণীয় হয়ে আছে অবিভক্ত মালদহে নেত্রী ইলা মিত্রের অবদান। ১৯৪০-এর দশকে বালুরঘাটে মহিলা সমিতি সক্রিয় ছিল। বালুরঘাটের কুমুদকামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী গুহ, প্রভা চট্টোপাধ্যায়, বেলারানি চট্টোপাধ্যায় (মাইজি), অমিয়া বসু, চকবানীর লতিকা শিকদার প্রমুখরা মহিলা সমিতির সদস্য ছিলেন। বালুরঘাটে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছিল দেখার মতো। কংগ্রেস কার্যালয়ের একটি কক্ষে ছিল মহিলা সমিতির কার্যালয়। মহিলা সমিতির আড়ালে পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে সংগ্রামীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

অতি সংক্ষেপে উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক ঘটনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা অনুচ্চারিতই রয়ে গেল। সেই সঙ্গে অনুচ্চারিত রয়ে গেল সেই সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম যারা দেশভাগের বলি হয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের মাটিতে।

সহায়ক পুস্তক ঃ বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ, সম্পাদনা কমলেশ গোস্বামী; উত্তরবঙ্গের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনালেখ্য, প্রকাশক : ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতি, কোচবিহার; উত্তরবঙ্গের ইতিহাস : সমিত ঘোষ।

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

সূর্য সেনের মৃতদেহকেও নিরাপদ মনে করেনি ইংরেজরা

বাসুদেব ধর

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছিল, অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল দেশের মাটি। সুদূর চট্টগ্রামে তখন স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন টগবগ করা দুঃসাহসী কিছু তরুণ, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাস্টারদা সূর্য সেন।

৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্টের নগেন্দ্রনাথ সেন ১৯১৮ সালে চট্টগ্রামে এসে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী ও চারুবিকাশ দত্তের সঙ্গে দেখা করেন। এ সময় সূর্য সেন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য হরিশ দত্তের জাতীয় স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে গেলে তিনি দেওয়ানবাজারে বিশিষ্ট আইনজীবী অন্নদা চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন।

১৯২০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে অনেক বিপ্লবী এই আন্দোলনে যোগ দেন। সূর্য সেনও অসহযোগে যোগ দেন। তবে গান্ধীজীর অনুরোধে বিপ্লবীরা তাদের কর্মসূচি এক বছরের জন্যে স্থগিত রাখেন। গান্ধীজী ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলে বিপ্লবী দলগুলো আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাস্টারদা বিপ্লবীদের সংগঠিত করেন। তখন চট্টগ্রাম কোর্টের ট্রেজারি থেকে পাহাড়তলিতে অবস্থিত অসম-বেঙ্গল রেলওয়ে কারখানার শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন নিয়ে যাওয়া হতো। ১৯২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর টাইগার পাস মোড়ে সূর্য সেনের বিপ্লবী সংগঠনের কর্মীরা দিনের আলোয় বেতন নিয়ে যাওয়ার সময় ১৭,০০০ টাকার বস্তা ছিনিয়ে নেন। এই ঘটনার প্রায় দু'সপ্তাহ পর গোপন বৈঠকের সময় কোনো সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুপক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়, যা ইতিহাসে 'নাগরখানা পাহাড় খণ্ড-যুদ্ধ' নামে পরিচিত। মাস্টারদা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। তার খোঁজে পুলিশ তোলপাড় করে সারা দেশ। অবশেষে ১৯২৬ সালের ৮ অক্টোবর মাস্টারদা সূর্য সেন কলকাতায় আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। মাস্টারদাকে মেদিনীপুরে সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় বর্তমান মুম্বাইয়ের রতনগিরি জেলে।

১৯২৮ সালে কলকাতার পার্ক সার্কাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে চট্টগ্রাম থেকে যে প্রতিনিধিদল যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন, লোকনাথ বল, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রমুখ। ওই অধিবেশন চলাকালে সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে সূর্য সেনের বৈঠক হয়। ১৯২৯ সালে মহিমচন্দ্র দাস ও সূর্য সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৩০ সালের গোড়া থেকেই সূর্য সেন ও অম্বিকা চক্রবর্তী আসকার দিঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত কংগ্রেস অফিসে বসে ভবিষ্যতে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপরেখা নিয়ে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করতেন। সেসময় তারা আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের দলের নাম পরিবর্তন করে রাখেন ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি, চিটাগং ব্রাঞ্চ। বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের বিষয়টি তখন প্রধান সমস্যা হিসেবে আলোচিত হয়। এ লক্ষ্যেই সিদ্ধান্ত হয় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের। দিন স্থির হয় ১৮ এপ্রিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত দশটায় বাড়ি থেকে বিপ্লবীদের চারটি দল বের হয়। সীতাকুণ্ডে ধুম স্টেশনে রেল লাইনের ফিসপ্লেট খুলে রাখা হয়েছিল, সে রাতেই একটি মালবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে উল্টে যায়। চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় গোটা দেশ থেকে। অন্য একটি দল নন্দনকাননে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস আক্রমণ করে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সব যন্ত্রপাতি ভেঙে দেয়। তারপর পেট্রোল ঢেলে

আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গণেশ ঘোষের দলটি পাহাড়তলীতে অবস্থিত চট্টগ্রাম রেলওয়ে অস্ত্রাগার দখল করে নেয়। উন্নতমানের রিভলবার ও রাইফেল তুলে নিয়ে অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করা হয়। তবে সেখানে গুলি পাওয়া যায়নি। লোকনাথ বলের নেতৃত্বে চতুর্থ দল দামপাড়ায় পুলিশ রিজার্ভ ব্যারাক দখল করে নেয়। এই অভিযানে অংশ নেওয়া বিপ্লবীরা দামপাড়া পুলিশ লাইনে সমবেত হয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং সামরিক কায়দায় অধিনায়ক মাস্টারদাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মাস্টারদা অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। বিপ্লবীদের এই চতুর্মুখী অভিযানের পর চট্টগ্রাম ব্রিটিশ শাসন থেকে চারদিন স্বাধীন ছিল।

ব্রিটিশ বাহিনী সংগঠিত হয়ে ২২ এপ্রিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পালটা আক্রমণ শুরু করে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে (বর্তমানে সেনানিবাসের পাহাড়) অবস্থান নিয়েছিল। সুসজ্জিত ইংরেজ বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে আক্রমণ চালায়। দু'ঘন্টার প্রচণ্ড লড়াইয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর ৭০ থেকে ১০০ জন প্রাণ হারায়। অপরদিকে ১২ জন বিপ্লবী প্রাণ হারান। এদের মধ্যে ছিলেন নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, হরিগোপাল বল, মতিলাল কানুনগো, প্রভাসচন্দ্র বল, শশাঙ্কশেখর দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, পুলিনচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দু দস্তিদার।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের দিন বিপ্লবীদের আর একটি পরিকল্পনা ছিল পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ, কিন্তু গুড ফ্রাইডে থাকায় ওইদিন ক্লবে কেউ ছিল না। তাই পরিকল্পনা পালটাতে হয়। মাস্টারদা এই ক্লাবে আক্রমণের দিন স্থির করেন ১৯৩২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। মাস্টারদার নির্দেশে বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতে দলের বিপ্লবী সদস্যদের নিয়ে প্রীতিলতা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। ওই অভিযানে ৫৩ জন ইংরেজ হতাহত হয়েছিল। গুলিতে আহত প্রীতিলতা ধরা পড়ে দৈহিকভাবে অত্যাচারিত হওয়ার চাইতে স্বেচ্ছামৃত্যুকে বেছে নেন। তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেন-সহ ছয় শীর্ষ বিপ্লবী নেতাকে ধরার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা শুরু করে ইংরেজরা। তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সূর্য সেন গৈরলা গ্রামে ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে মাস্টারদা সেখানে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত, ব্রজেন সেন ও সুশীল দাশগুপ্ত। ব্রজেন সেনের সহোদর নেত্র সেন পুরস্কারের লোভে সূর্য সেনের উপস্থিতির কথা পুলিশকে জানিয়ে দেন। রাত প্রায় ১০টার সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী বাড়ি ঘিরে ফেলে। রাতের অন্ধকারে গুলি বিনিময়ের মধ্যেই কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী, মণি দত্ত ও সুশীল দাশগুপ্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। রাত দুটোর সময় সূর্য সেন ও ব্রজেন সেন অস্ত্রসহ ধরা পড়েন। সেই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ সূর্য সেনের নিজের লেখা অর্ধসমাপ্ত আত্মজীবনীর খাতা 'বিজয়া' উদ্ধার করে। বিচারের সময় এই 'বিজয়া'র লেখাই মাস্টারদার বিরুদ্ধে বিপ্লব ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুরস্কারের টাকা পাওয়ার আগেই বিপ্লবীরা নেত্র সেনকে হত্যা করে।

মাস্টারদা সূর্য সেন গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারকেশ্বর দস্তিদার দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু আনোয়ারা থানার গহিরা গ্রামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক সংঘর্ষের পর তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হন। সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচারের জন্যে ইংরেজরা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১/১২১এ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ১৯৩৩ সালের ১৫ জুন মামলার কাজ শুরু হয়। তবে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা ছাড়া আর কোনো অভিযোগ সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করা যায়নি। মামলার রায় ঘোষণা করা হয় ১৯৩৩ সালের ১৪ আগস্ট। ট্রাইব্যুনাল সূর্য সেনকে ১২১ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদন্ডের আদেশ দেয়। একই ধারায় তারকেশ্বর দস্তিদারেরও প্রাণদণ্ড হয়। কল্পনা দত্তকে দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মাস্টারদাকে কড়া পাহাড়ায় কনডেম্ড সেলে রাখা হতো। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি মধ্যরাতে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি কার্যকর হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। জানা যায়, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে নির্মমভাবে অত্যাচার করা হয়। পরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়। ফাঁসির পর সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের মৃতদেহ তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। হিন্দু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী দাহ করার সুযোগও দেওয়া হয়নি। জানা যায়, দুই বিপ্লবীর মৃতদেহ কারাগার থেকে সরাসরি চট্টগ্রাম বন্দরের ৪ নম্বর স্টিমার ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর ব্রিটিশ ক্রুজার 'দ্য রিনাউন'-এ তুলে দেওয়া হয়। মৃতদেহের বুকে লোহার টুকরো বেঁধে ডুবিয়ে দেওয়া হয় সাগরজলে। বিপ্লবীদের মরদেহকেও নিরাপদ মনে করেনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা। □

গণেশ ঘোষ

তারকেশ্বর দস্তিদার

কল্পনা দত্ত

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

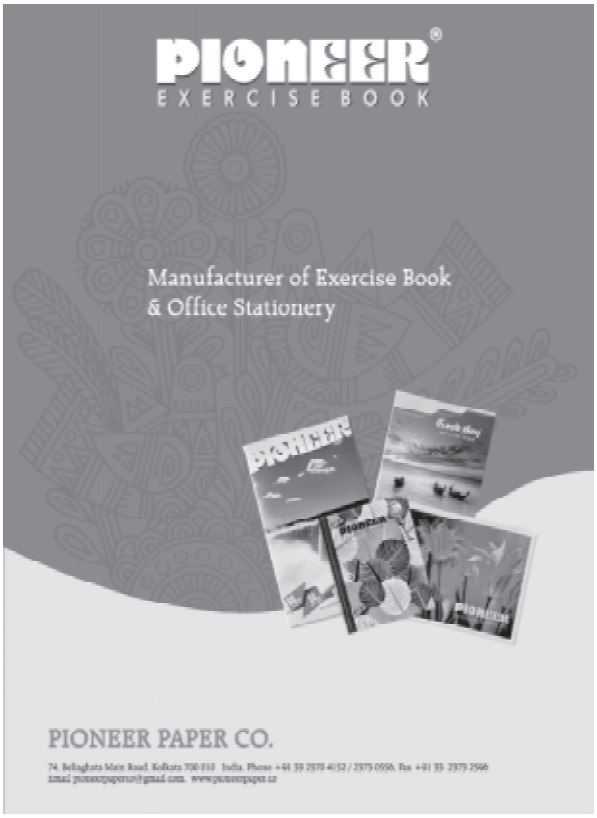

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

ব্রিটিশ সামাজ্যবাদী শোষণ ও ভারতীয় অর্থনীতির ওপর তার প্রভাব

বিমল শংকর নন্দ

একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার শাসকবর্গ যখন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্য দেশের উপর তাদের আধিপত্য ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে তখন কোনো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকে। নিজের অর্থাৎ আক্রমণকারীর জাতিগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে আর্থিক সুবিধালাভ–– নানা উদ্দেশ্যেই সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটেছে। স্পষ্টভাবে বললে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায় থেকেই সাম্রাজ্যবাদের জন্ম। আর এই অভিপ্রায়ের সৃষ্টি হয় প্রধানত অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য জাতিগত, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কারণে। যোসেফ সুমিপিটার, রুডোলফ হিলফারডিং জন এ. হবসন কিংবা ভ্লাদিমির লেনিন তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকেই ব্যাখ্যা করেছেন পুঁজির বৃদ্ধি ও প্রসারের নিরিখে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রুডইয়ার্ড কিপলিঙের মতো সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক লেখক যতই 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' (অর্থাৎ এশিয়া-আফ্রিকার দেশীয় মানুষগুলো এত পিছিয়ে পড়ে যে ওরা সুসভ্য সাদা মানুষ বিশেষত ইংরেজদের বোঝা। কিন্তু সাদা মানুষরা স্বেচ্ছায় এই বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে আধুনিক সভ্যতা বিকাশের স্বার্থে) তত্ত্বকে বৈধকরণের চেষ্টা করুন, বাস্তবে ভারতে ব্রিটিশরা এসেছিল তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে নিজের দেশের আর্থিক লাভালাভের কথা মাথায় রেখে।

ষোড়শ শতক থেকেই ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অঙ্কুরোদ্‌গম হয় এবং সপ্তদশ শতক থেকেই গোটা ইংল্যান্ড তথা ইউরোপে উদারনীতিবাদ এসেছে পুঁজিবাদের হাত ধরে। তাই ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতকের একটি বড়ো অংশ জুড়ে পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে উঠে আসা উদারনীতিবাদের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ রাজতন্ত্রের আধিপত্যবাদী ভাবনার লড়াই লক্ষ্য করা যায়। এই লড়াইতে জয় হয়েছিল উদারনীতিবাদীদের। ১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে। গৌরবময় বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটেনে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থের ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে ব্রিটেনের সরকার। ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণী ব্রিটিশ সরকারি ব্যবস্থাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পরই নজর দেয় এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির দিকে। পুঁজিবাদের দ্রুত বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল সস্তায় কাঁচামাল ও শ্রম এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার। ব্রিটেনের মতো অত্যন্ত ছোট একটি দেশে কাঁচামালের অফুরন্ত জোগান এবং উৎপাদিত পণ্যের বিশাল বাজার পাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ভারতের মতো দেশ ছিল ব্রিটেনের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত দেশ। ১৬১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেনের রাজা প্রথম জেমসের চিঠি নিয়ে

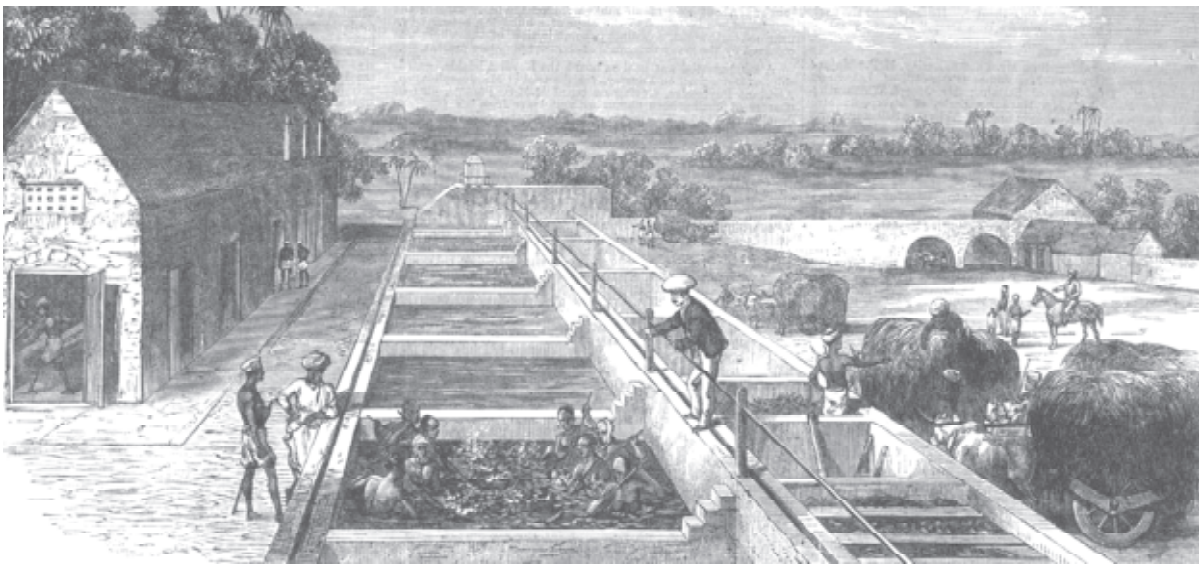

ফ: ৯

ভারতে আসেন ব্রিটিশ দূত স্যার টমাস রো। নামেন সুরাট বন্দরে। ভারতে তখন মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনকাল। সার টমাস রো ছিলেন ভারতে প্রথম ব্রিটিশ প্রতিনিধি।

প্রায় তিন বছর মুঘল দরবারে কাটিয়েছিলেন এবং ১৬১৯ সালে তিনি দেশে ফিরে যান। অবশ্য যে ধরনের বাণিজ্য চুক্তি করার আশা নিয়ে তিনি ভারতে এসেছিলেন তা তিনি করতে পারেননি। কিন্তু স্যার টমাস রো-এর আগমন ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য সম্পর্কের একটি দিক উন্মোচিত করেছিল। ১৬০০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছিল ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে যা রয়াল চার্টার নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে তাদের প্রতিনিধি উইলিয়াম হকিন্স ১৬০৮ সালে জাহাঙ্গিরের দরবারে আসেন। কিন্তু তাঁর সফর খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। সুরাটে একটা ফ্যাক্টরি স্থাপনের অনুমতি চেয়েছিল ব্রিটিশরা। কিন্তু মুঘল সম্রাট তাদের সেই অনুমতি দেননি। আসলে তখন ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো পর্তুগিজরা। মুঘল দরবারে তাদের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। তাদের প্রভাবেই মুঘল সম্রাট ব্রিটিশদের বিশেষ কোনও সুবিধা দিতে চাননি। স্যার টমাস রো সুরাটে বাণিজ্য করার অনুমতি পেতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুরাটের পাশাপাশি আগরা, আহমেদাবাদ ও ব্রোচ অঞ্চলে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি পেয়েছিল ব্রিটিশরা। পরবর্তীতে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই শহরে ব্রিটিশরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে শুরু করে। ব্রিটিশ সমাজ এবং অর্থনীতির পুঁজিবাদী বিকাশের ক্ষেত্রে এই শহরগুলি বিশেষত কলকাতা শহর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

উপরের সংক্ষিপ্ত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে বিদেশি বণিকদের কাছে ভারতবর্ষ ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের এক আকর্ষণীয় গন্তব্যস্থল। ১৭শ শতকে যোগাযোগ ব্যবস্থার আনেকটাই উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের বাণিজ্যিক এবং অন্যান্য সম্পর্ক অনেক পুরনো। খ্রিস্টের জন্মের আগে থেকেই এই যোগাযোগের প্রমাণ মেলে। ভারতে ইসলামি শাসন শুরু হয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। তার আগে পর্যন্ত ভারতে ছিল হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। ইউরোপের সমাজে উদারনীতিবাদের উদ্ভব ঘটেছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে, পুঁজিবাদের বিকাশের পথ বেয়ে। কিন্তু ভারতের সমাজে উদারনীতিবাদের প্রভাব অনেক পুরনো। হিন্দুধর্ম মূলত উদারনীতিকে অবলম্বন করেই থেকে গেছে। আর হিন্দু সমাজের সে সব ত্রুটি ক্রমেই সামাজিক সমস্যা তৈরি করছিল সেগুলির সংস্কারসাধন করে বৌদ্ধ ধর্ম। ভারতে স্বৈরাচারী এবং শোষণমূলক শাসনের সূত্রপাত ঘটে ইসলামি শাসনে। কিন্তু হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজারা একনায়কতান্ত্রিক হলেও অত্যাচারী বা শোষণকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অর্থনীতির মুক্ত বিকাশের পক্ষে এই উদারবাদী সমাজ ছিল অত্যন্ত সহায়ক। ফলে প্রাচীন ভারতীয় জনপদগুলোর অধিকাংশ ছিল সমৃদ্ধ। বিদেশি বণিকদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। স্যার চার্লস মেটকাফে, শেলভংকর, ওম্যালি কিংবা ডি. আর. গ্যাডগিল প্রমুখ লেখকের গবেষণায় এদেশের প্রাচীন অর্থনীতির চরিত্র সম্পর্কে অনেক তথ্য মেলে। এরা সকলে একটি বিষয়ে একমত যে প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতির মুখ্য একক ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি গ্রাম যা আদি যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। স্যার চার্লস মেটকাফের ভাষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি ছিল যেন এক একটি ক্ষুদ্র গণতন্ত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেছে, বিভিন্ন রাজবংশ ও শাসন ব্যবস্থার উত্থান ও পতন ঘটেছে। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। এই ধারাবাহিকতাই জনপদগুলির অর্থনীতিকে ধ্বংস হতে দেয়নি। প্রশাসন পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে রাজধানী বা তীর্থক্ষেত্র হিসেবে কিছু শহরের অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। কিন্তু সনাতন ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির ধারক ও বাহক ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা। বিদেশিদের কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য, যা তৈরি হতো ছোট বা মাঝারি কুটির শিল্পে। ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকলার দ্বারা চমৎকৃত হতো অবশিষ্ট পৃথিবী। এ প্রসঙ্গে ভি. এফ. ক্যালভারটেনের বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। ক্যালভারটন বলেছেন, ''ভারতের শিল্পগুলি ছিল পশ্চিমের তুলনায় অনেক উন্নত। সেগুলি ছিল অসাধারণ বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতার ফসল। যখন পশ্চিমের দেশগুলির কারিগররা জলপথে পরিবহণের জন্য যানবাহন তৈরি শুরু করেছে, ভারতীয় কারিগররা তখন বিশালাকৃতির ভারী জাহাজ তৈরি করেছে'। ক্যালভারটন বস্ত্রশিল্প, কাঠের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, বিভিন্ন ধাতুর কাজে ভারতীয় শিল্পীদের অসাধারণ দক্ষতা এবং তার প্রতি সারা পৃথিবীর আকর্ষণের উল্লেখ করেছেন। ইউরোপ ও আরবের বণিকরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইতো ভারতে উৎপাদিত উন্নত পণ্যদ্রব্যের লোভে। ক্রমে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজিত করে ব্রিটিশরা আরও বেশি পরিমাণে ভারতে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে থাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে গোটা অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে যখন ব্রিটেনে পুঁজিবাদের বিপুল উত্থান শুরু হয়, ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে ছোটো-বড়ো কলকারখানা, ব্যবসায়ী পুঁজির গুরুত্ব কমে গিয়ে শিল্পপুঁজির গুরুত্ব বাড়তে থাকে—তখনকার ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং তাদের স্বার্থরক্ষাকারী ব্রিটিশ রাজের নজর পরে ভারতের কাঁচামাল এবং বিশাল সম্ভাবনাময় বাজারের দিকে। এদুটিকে হাতে পেতে গেলে গোটা দেশ ও তার শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শক্তি তাই ভারতের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা চালিয়ে গেছে যা সাফল্যের মুখ দেখল ১৭৫৭ সালে। পতনের মুখে থাকা মোগল সাম্রাজ্য এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলতে থাকা ডামাডোলের পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল ব্রিটিশরা।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শুরু হয়েছিল বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপায়িত হওয়ার পর। ১৬০০ থেকে ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল মূলত একটি ট্রেডিং করপোরেশন যারা ভারতীয় রাজাদের সম্মতি নিয়ে (কখনো কখনো বেআইনিভাবে সম্মতি ছাড়াই) আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য চালাত। কোম্পানি ভারত থেকে বিদেশে বিশেষত ইউরোপে যেসব দ্রব্য রপ্তানি করত তার মধ্যে ভারতের বিখ্যাত মশলা ও বস্ত্র ছিল। বাইরের ক্রেতাদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সময়ের মধ্যে ভারতে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ইউরোপের বাজারে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই প্রসঙ্গে W.E.H. Lecky তাঁর History of England in the Eighteenth century গ্রন্থে লিখেছেন যে, ''১৭শ শতাব্দীর শেষে ইউরোপের বাজারে ভারতীয় সিল্ক এবং অন্যান্য বস্ত্রের রপ্তানি সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছেছিল। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসাও তখন অত্যন্ত লাভজনক হয়ে উঠেছিল। অবস্থা এমন দাঁড়ায় ইংল্যান্ডের দেশীয় শিল্পগুলির মালিকরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানাতে থাকে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য। এই সময় ব্রিটিশ সরকার এই উদ্দেশ্যে কিছু আইনও তৈরি করে। পলাশীর যুদ্ধ জয়ের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এর ফলে কোম্পানির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ার এসে যায়। ব্রিটিশ পুঁজির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি করতে ভারতীয় জনগণকে ব্রিটেন থেকে আমদানিকৃত দ্রব্য কিনতে বাধ্য করতে, ভারতীয় কারিগরি শিল্পকে ধ্বংস করতে ব্রিটিশ শক্তি তার রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগায়।

১৭৫৭ থেকে পরবর্তী ১০০ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিস্তার ঘটাতে প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে চালান করে। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটানোর জন্য এগুলো ছিল 'প্রাথমিক পুঁজি'। Brooks Adams তাঁর Law of civilization and Decay গ্রন্থে এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন—''১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল এবং তারপর সবক্ষেত্রে অতি দ্রুত পরিবর্তন এসেছিল। ১৭৬০ সালে উড়ন্ত মাকুর (flying shuttle) আবিষ্কার হয় এবং লোহা গলানোর ক্ষেত্রে কাঠের বদলে কয়লার ব্যবহার শুরু হয়। ১৭৬৪ সালে হারগ্রিভস আবিষ্কার করেন সুতো কাটার আধুনিক স্পিনিং জেনি, ১৭৭৬ সালে ক্রম্পটন আবিষ্কার করলেন আধুনিক সুতোকল, ১৭৮৫ সালে কার্টরাইট শক্তিচালিত তাঁতের পেটেন্ট লাভ করেন। আর ১৭৬৮ সালে জেমস ওয়াট বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।'' এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থ সেগুলি লুণ্ঠিত হচ্ছিল ভারত থেকে। কারণ ১৭৫৭ থেকে ব্রিটিশ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে লুণ্ঠনের কাজে লাগাতে শুরু করে। ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। Adams-এর ভাষায়, ''পৃথিবীর জন্ম থেকে সম্ভবত কোনও দেশ এত মুনাফা অর্জন করতে পারেনি যা ব্রিটেন করেছিল ভারতীয় লুণ্ঠন থেকে, কেননা প্রায় ৫০ বছর গ্রেট ব্রিটেন ছিল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। ১৬৯৪ থেকে পলাশী যুদ্ধ পর্যন্ত অগ্রগতি ছিল আপেক্ষিকভাবে মন্থর, ১৭৬০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত তা ছিল অত্যন্ত দ্রুত এবং বিপুল।''

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এসেছিল দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ করে নিজের দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজই চালিয়ে গেছে।

শিল্প বিপ্লবের আর্থিক পুঁজি সংগৃহীত হয়েছিল ভারত থেকে। আর শিল্প বিপ্লবের ফল হিসেবে ব্রিটেনে শিল্প উৎপাদকশ্রেণীর শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এদের সহায়তা করতে ব্রিটিশ সরকার এমন উপায় অবলম্বন করতে থাকে, যার ফলে ভারতীয় হস্তশিল্প কঠিন আঘাত পায় এবং দ্রুত ধ্বংস হয়ে যায়। ভারত থেকে ব্রিটেনে রপ্তানি করা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠতো না ইংলেন্ডের দেশীয় পণ্য তাই তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে নানা ধরনের আইন প্রণয়ন করতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার। A. R. Desai তাঁর Social Background of Indian Nationalism গ্রন্থে এ বিষয়ে Horace Willson-এর একটি বক্তব্য পেশ করেছেন—''ভারতের সঙ্গে সূতিবস্ত্র বাণিজ্যের ইতিহাস হলো ভারতবর্ষের প্রতি অন্যায় আচরণের এক যন্ত্রণাময় ইতিহাস। এই অন্যায় করেছে এমন একটা দেশ যার উপর সে (ভারতবর্ষ) নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের কোনও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বা ডিক্রি যদি না থাকতো তাহলে পেসলি বা ম্যাঞ্চেস্টারের মিলগুলো শুরুতেই বন্ধ হয়ে যেত, এমনকী বাষ্পশক্তিতেও তাকে আবার চালু করা যেত কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকলে নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নিত — আত্মরক্ষার এই উপায় তার ছিল না, সে ছিল বিদেশিদের করুণায়। কোনোরকম শুল্ক না দিয়েই ব্রিটিশের দ্রব্য তার ঘাড়ে চাপানো হতো, আর বিদেশি উৎপাদনকারী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয় পেয়ে তার ভারতীয় প্রতিযোগিকে নষ্ট এবং ধ্বংস করে দিয়েছিল। সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবেশ থাকলে কখনোই সে তা করতে পারতো না।'' B.D. Basu তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Ruin of Indian Trade and Industries-এ ভারতে থেকে ইংল্যান্ডে যে সব দ্রব্য রাপ্তানিকরা হতো তাদের উপর ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আরোপিত শুল্কের এক বিস্তৃত তালিকা দিয়ে প্রমাণ করেছেন কীভাবে ব্রিটিশ সরকার তার নিজস্ব শিল্পকে প্রতিপালনের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। B. D. Basu মনে করেন যে, ব্রিটেন ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পর ভারতীয় শিল্পগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছিল এই ভাবে—(ক) ভারতের উপর ব্রিটিশের অবাধ বাণিজ্য চাপিয়ে দিয়ে; (খ) ইংল্যান্ডগামী ভারতীয় পণ্যের উপর অত্যধিক শুল্ক চাপিয়ে, ভারত থেকে কাঁচামাল রপ্তানি করে; নানা ধরনের কর ও শুল্ক চালু করে, ভারতে ব্রিটিশদের বিশেষ অধিকার দিয়ে; (গ) ভারতে রেলওয়ে তৈরি করে; (ঘ) ব্যবসার গোপন তথ্য প্রকাশ করতে ভারতীয় কারিগরদের বাধ্য করে ইত্যাদি। ১৮১৩ সালে ব্রিটিশ সরকার একটি সনদের মাধ্যমে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেয় এবং ইংল্যান্ডের সমস্ত বণিককে ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার দিয়ে দেয়। এই নতুন শ্রেণীর বণিকরা ভারতে উৎপাদিত পণ্য কিনতে ভারতে আসেনি। এরা আসতো ইংল্যান্ডে তৈরি দ্রব্যের বাজার খুঁজতে এবং ভারতে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সন্ধান করতে। এইভাবে একটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ব্রিটেনে উৎপাদিত পণ্যের এক বিশাল বাজার আর ব্রিটিশ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের এক জোগানদার দেশ। ভারতীয় শিল্পের জন্য ইউরোপের বাজার তো বন্ধ হয়ে তো গেলই, তার সঙ্গে দেশীয় কারিগরদের স্বার্থরক্ষাকারী ও মদতদাতা দেশীয় রাজাদের রাজত্ব হয় কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কিংবা ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে থাকা করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল। ভারতীয় হস্তশিল্পের উপর এর সর্বনাশা প্রভাব পড়েছিল। ১৯০২ সালে প্রকাশিত Poverty and Un-British Rule in India গ্রন্থে দাদাভাই নওরোজী তাঁর বিখ্যাত Drain Theory প্রচার করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষপাতমূলক নীতির ফলে ভারতের কত সম্পদ ব্রিটেনে নিষ্কাশিত হয়েছে তিনি তার একটা হিসেবও দিয়েছেন। তাঁর মতে ভারতের ২০০ থেকে ৩০০ মিলিয়ন পর্যন্ত অর্থ অন্যায়ভাবে নিষ্কাশিত হয়ে ব্রিটেনে চলে গেছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এসেছিল দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিকে শোষণ করে নিজের দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজই চালিয়ে গেছে। শোষণ হল সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদ থেকে শোষণকে আলাদা করা অসম্ভব। ▯

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

ইংরেজিয়ানার আবর্জনা সরিয়ে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সফল ভারত

ড: তরুণ মজুমদার

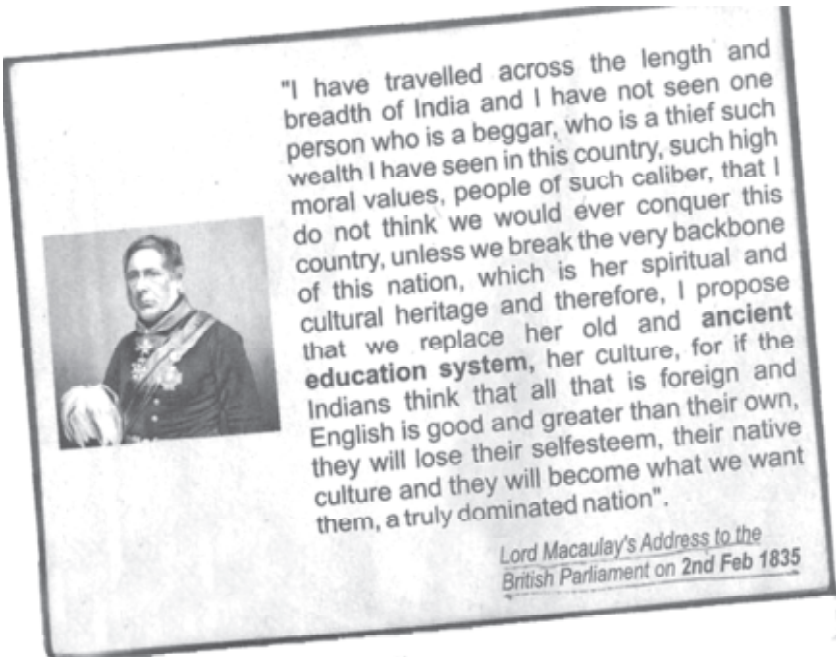

দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এই ব্যবস্থা বাস্তবিক অর্থেই কেরানি সৃষ্টির কারখানায় পর্যবসিত হয়েছিল, কারণ তা কখনোই দেশে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষ জনসম্পদ তৈরি করতে পারেনি, সৃষ্টি করেছে কেবল বস্তুকেন্দ্রিক পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনকারী শিক্ষিত বেকার গোষ্ঠী। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও আমাদের দেশ এই দীর্ঘ ছায়া থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া একটি বক্তৃতায় কোম্পানির শিক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান টমাস ব্যাবিংটন মেকলে নীতি-নির্ধারণী এক মিটিঙে বলেন, ''আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে, যারা আমাদের এবং আমরা যাদের শাসন করছি তাদের মাঝে ব্যাখ্যাকার (দালাল) হিসেবে কাজ করবে। এটি এমন মানুষের শ্রেণী যারা রক্ত ও বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, মতামতে, মূল্যবোধে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে ইংলিশ।'' এই বক্তব্যই ব্রিটিশদের আসল উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেয়। তিনি শিক্ষাসংক্রান্ত যে স্মারক পেশ করেন, তাতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বস্তুকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়। যদিও প্রায় একই সময়ে শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা উইলিয়াম অ্যাডাম ব্যাপকতর শিক্ষা বিস্তারের বিকল্প হিসেবে একটি রিপোর্ট পেশ করেছিলেন। অ্যাডাম শিক্ষা বিস্তারের মৌলিক ইউনিট হিসেবে গ্রামকে গণ্য করেন এবং নিম্ন পর্যায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য সরকারি বরাদ্দের সুপারিশ করেন। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অ্যাডামের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের পথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না, ফলে তথাকথিত filtration theory'-র ভিত্তিতে যে শিক্ষানীতি প্রচলিত হয় তা দীর্ঘদিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নিগড়ে আবদ্ধ থাকে। কারণ এই থিয়োরির মূল ভিত্তি ছিল সমাজের উচ্চশ্রেণীকে শিক্ষিত করে সরকারি তাঁবেদার বানিয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া এবং একইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে একটি safety valve প্রস্তুত রাখা।

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচ সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য দেশীয় ভার্নাকুলার স্কুলগুলিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার সুপারিশ করে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে কীভাবে কী পড়ানো হবে, তা বিন্যস্ত করে দেওয়া হয়। উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি অনুদান পেতে শুরু করে কিন্তু শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন সুকৌশলে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যাওয়া হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈতিক বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছিল তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৮৮২ সালে গঠিত হান্টার কমিশন সাতশো পাতার দীর্ঘ রিপোর্টে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল চিত্র তুলে ধরে। রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি সরকারি চাকরিতে সম্মানজনক অবস্থান কিংবা শিক্ষিত পেশার একটি পাসপোর্ট হিসেবে বিবেচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যা আজও আমাদের সমাজে বিদ্যমান, যার একমাত্র উদ্দেশ্য কম মাইনেতে ইংরেজি-শিক্ষিত কেরানির দল তৈরি করা। কার্জনের আমলে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয়, যেখানে একটি রেজোলিউশনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে ওঠা

অভিযোগগুলি স্বীকার করে নেওয়া হয়। অভিযোগগুলি ছিল — উচ্চশিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য সরকারি চাকরি; পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ; মেধা বিকাশের পরিবর্তে মুখস্থ বিদ্যার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ; যথার্থ শিক্ষার পরিবর্তে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির প্রাধান্য। এই মুল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করা হলেও তা সমাধানে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তারা কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ১৯১৭ সালে গঠিত স্যাডলার কমিশন এবং ১৯২৯ সালে হার্টগ কমিশন শিক্ষার গুণগত মান বিকাশের সুপারিশ করলেও ব্রিটিশ সরকার সেগুলিকে বাস্তবায়িত করেনি। এই প্রেক্ষিতেই ১৯৩১ সালে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী বলেছিলেন, ''The beautiful tree of education was cut down by you British. Therefore today India is far more illiterate than it was 100 years ago.'' ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় ওয়ার্ধা স্কিম নামে একটি শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু মৌলিক পেশায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিষয় চয়ন করার অধিকার প্রদান করার কথা বলা হয়েছিল যা আক্ষরিক অর্থেই ছিল জীবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে শিক্ষার যোগসূত্র স্থাপনের একটি সচেতন প্রয়াস। কিন্তু ঔপনিবেশিক কেতাবি শিক্ষায় শিক্ষিতরা উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতেই দূরে সরে গিয়েছিল। কীট দংশিত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রকৃতি, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্য স্থাপন ও মূল্যবোধের বিকাশকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র তত্ত্বগত শিক্ষা ও অনিয়ন্ত্রিত যান্ত্রিকতার উপর অসম গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, যা এদেশের নাগরিকদের তাদের সুপ্রাচীন ঋদ্ধ সংস্কৃতিকে নিকৃষ্ট মনে করতে এবং একইসঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে উন্নত ও উচ্চতর মার্গের বলে মনে করতে শিখিয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটেই ভারত সরকার ২০২০ সালে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে এসেছে, যা ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পালটে নতুন ভারত গড়ার কারিগর হয়ে উঠতে চলেছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হলো যুক্তিবাদী চিন্তায় সক্ষম একজন ভালো নাগরিক গড়ে তোলা যে তার বৈজ্ঞানিক মনন, সহানুভূতিশীল আচরণ ও নৈতিক মূল্যবোধে বিরাজিত হয়ে নতুন ভারত গঠনের পুণ্য কাজে অংশগ্রহণ করে শ্লাঘা বোধ করতে পারবে। একবিংশ শতাব্দীতে অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করা, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন দিশার উন্মেষ ঘটানো, দেশকে সারা বিশ্বের সামনে পুনরায় জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করা এবং পুনর্জাগরিত ভারতীয় সমাজের সার্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ কস্তুরীরঙ্গনের নেতৃত্বে দেশের আড়াই লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েত, সাড়ে বারো হাজার স্থানীয় প্রশাসন এবং ৬৭৫ টি জেলা থেকে গৃহীত দুই লক্ষ পরামর্শকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরাকাষ্ঠায় বিচার বিবেচনা করেই এই শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপির ছয় শতাংশ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিশ্চিতভাবেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। বিদেশে মেধা চলে যাওয়ার যে জ্বলন্ত সমস্যায় এ রাজ্য তথা সারাদেশ ভুক্তভোগী, সেই সমস্যা নিরসনে নতুন এই শিক্ষা নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এদেশে ক্যাম্পাস খোলার পথ প্রশস্ত করবে।

কবিগুরু ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে কেরানি তৈরির বিরোধিতা করে সৃজনশীলতার প্রকাশের মাধ্যমে পূর্ণ মানুষ তৈরির কথা বলেছিলেন। নতুন শিক্ষানীতির নির্যাসও ঠিক একই দিকে ইঙ্গিত করে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কবিগুরুর চিন্তন অনুসরণ করে শিক্ষকদের মর্যাদাকে গুরুত্ব সহকারে সম্মান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রথম হস্তশিল্পী, কৃষক, তন্তুবায়-সহ চিরাচরিত বিভিন্ন পেশার মানুষকে শিক্ষকের মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে তারা এখন থেকে প্রস্তাবিত ক্লাস্টার স্কুলে ক্লাস নিতে পারবেন। জ্ঞান সম্পদ ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে ক্লাস্টার গঠনের বিষয়টি নিজ গুণেই অনন্য সাধারণ। এই নয়া ব্যবস্থা শিক্ষকদের প্রকৃত যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেবে। এই শিক্ষানীতি স্বামীজীরও স্বপ্ন পূরণ করবে। স্বামীজী প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার মেলবন্ধন নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি স্বামীজীর সেই ভাবনারই সার্থক প্রতিফলন। নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু বস্তুমুখী শিক্ষার বিস্তার নয়, বরং তাতে প্রাণেরও সঞ্চার ঘটাবে। নয়া ব্যবস্থায় কোনো পাঠক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত হওয়া বা সেই পাঠক্রম থেকে বেরিয়ে আসার সংস্থান থাকায় তা ঘুরিয়ে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে। এক্ষেত্রেও স্বামীজীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, কারণ তিনি মনে করতেন গরিব ছাত্র-ছাত্রীরা যদি শিক্ষার কাছে পৌঁছতে না পারে তাহলে শিক্ষাকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ৫+৩+৩+৪ সূত্রটিতে সুচিন্তিত উপায়ে গুরুত্ব আরোপ করার ফলে যথাযথভাবে শিক্ষাদান সম্ভবপর হবে এবং আর্টস, কমার্স ও সাইন্স শাখার বস্তাপচা দমবন্ধকর ধ্যানধারণা থেকে বেরিয়ে এসে একজন শিক্ষার্থীকে তার পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে পড়ার সুযোগ করে দেওয়াটাই এই শিক্ষানীতির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। শুধুমাত্র পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে জানা বা উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ছাত্র সমাজের সঠিক ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যেই এই নীতি প্রণীত হয়েছে। এই জানা বা উপলব্ধির বিষয়টি পাঠ্যসূচির বাইরেও শামিল রয়েছে, যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক দক্ষতা বিকাশের উপর অতীব গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পদ্ধতির পরিবর্তে আগ্রহ, ব্যবহারিকতা, আত্মীকরণ এবং সম্পাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ঠিক যেমনটি স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ''Education is not the amount of information that we put into your brain and runs riot there, undigested, all your life. We must have life building, man making, character making assimilation of ideas. If you have assimilated five ideas and made them your life and character, you have more education than any man who has got by heart a whole library.''

ভারতীয় মনীষীদের শিক্ষা দর্শনকে ভিত্তি করে যে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে, শুধুমাত্র সস্তা রাজনৈতিক বিরোধিতার কারণে এবং সংবিধানের যৌথ তালিকার অনৈতিক সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদল যদি নিজেদের মননশীলতার অভাবজনিত কারণে তাকে দেশের সার্বিক শিক্ষানীতি না ভেবে কোনো নির্দিষ্ট সরকারের শিক্ষানীতি ভেবে বসে এর অহেতুক বিরোধিতা করে, তবে তা দেশের ছাত্র-যুবসমাজকে সম্ভাব্য নবজাগরণের পথ থেকে বিচ্যুত করে অনিবার্যভাবে ধ্বংসের পথে, বিকৃতির পথে নিয়ে যাবে। সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রার্থনা করি, অবিবেচক বিরোধিতার বিনাশ ঘটুক, শুভবুদ্ধির উদয় হউক; প্রকৃত মানুষ ও আত্মনির্ভর ভারতীয় সমাজ গড়ে উঠুক। □

স্বাধীনতার
অমৃত মহোৎসব

স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরভূমের অবদান

সোমেশ্বর বড়াল

১৮৫৫ সালে সিধো-কানহুর নেতৃত্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনজাতিদের যে বিদ্রোহ তা এখনকার ঝাড়খণ্ডের ভূখণ্ডে শুরু হয়ে আজকের বীরভূমে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভগ্নাডিহি গ্রাম থেকে বিদ্রোহী জনজাতিরা সিউড়ির দিকে অভিযান শুরু করে। তাদের বাধা দেওয়াতেই শুরু হয়ে যায় লড়াই। ১৮৫৫ সালের তিরিশে জুন যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তা প্রায় সাত মাস ধরে চলেছিল। নিজস্ব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বনবাসীরা ইংরেজ অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে গেছিল। অবশেষে নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। হাজার হাজার বনবাসীর রক্তে লাল হয়ে গেছিলো এইসব এলাকার লালমাটি। সিধো-কানহু-সহ শত শত বিদ্রোহীকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা দ্বীপান্তর। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামের ঠিক আগে পূর্ব ভারতের এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকদের যেমন ভাবিয়ে তুলেছিল দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষদের তেমনি প্রেরণা যুগিয়েছিল।

বীরভূমে স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব—জয়দেব কেন্দুলীর বৈষ্ণব মহন্ত দামোদরচন্দ্র ব্রজবাসী। বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন পোশাকে, খাবারে, লবণে পশুচর্বি ও রক্ত মিশিয়ে ধর্মনাশ করার চেষ্টা হচ্ছে—একথা মহন্তজী জনসভায় বলতেন এবং মানুষকে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ডাক দিতেন। তাঁর ডাক বীরভূমের সীমানা অতিক্রম করে অন্য জেলায় এমনকী কলকাতায় পৌঁছে যায়। উনি ১৯০৮ সালে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম জেলা সমিতির সদস্য হয়েছিলেন এবং দলের পরবর্তী প্রাদেশিক সম্মেলনে জেলার প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯২০ সালে ইংরেজদের গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা তিনি নিহত হন।

বীরভূমের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি নাম দুকড়িবালা দেবী। খুব সাধারণ পরিবারের এই গৃহবধূকে আলোড়িত করেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ হয় তাঁরই এক আত্মীয়, বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের সঙ্গে। সম্পর্কে নিবারণের মাসি ছিলেন দুকড়িবালা। নিবারণের সূত্রেই দুকড়িবালা দেবীর বাড়িতে বিপ্লবীদের যাতায়াত শুরু হয়। বিপ্লবীদলে দুকড়িবালা দেবী 'মাসিমা' নামেই পরিচিত ছিলেন। বিপ্লবীদের কাছ থেকে দুকড়িবালাও শিখে নেন বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রচালনার কলাকৌশল। ১৯১৪ সালের ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির ৫০টি জার্মান মাউসার পিস্তল এবং কার্তুজের বাক্স কলকাতা বিমানবন্দর থেকে লুঠ হয়। সশস্ত্র বিপ্লবীরাই এই অস্ত্র লুটের পিছনে ছিলেন। সেই লুট হওয়া পিস্তল ও কার্তুজের একটি বড়ো অংশ পৌঁছে যায় দুকড়িবালার বাড়িতে। সেসব সামলে রাখার দায়িত্ব নেন তিনি। কিন্তু পুলিশের কাছে খবর চলে যায়। অস্ত্র রাখার অভিযোগে ১৯১৭ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বিচারে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তিনিই ছিলেন বাঙ্গলার প্রথম বিপ্লবী মহিলা, যাঁর ওই সময় অস্ত্র আইনে সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

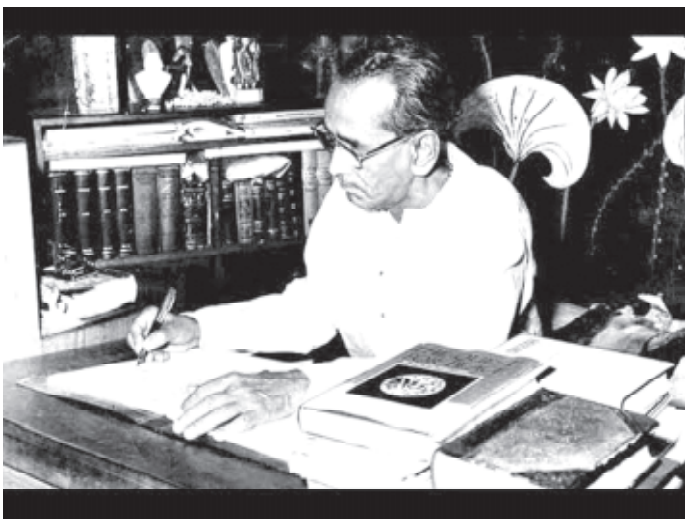

বাঙ্গলার সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরভূমের

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচিতি বোধহয় ইতিহাখ্যাত 'বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা'। ১৯৩০ সালের আগে ও পরের কয়েকটি বছর বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং অর্থ সংগ্রহের অভিযানে শামিল হন। শাসকের চোখে যা ছিল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। অস্ত্র ছিনতাই, ডাক লুট-সহ নানা কাণ্ডকারখানা শুরু হয় জেলা জুড়ে। জেলার সিউড়ি, দুবরাজপুর, লাভপুর, আমোদপুর, জাজিগ্রাম, ভালাসের মতো বিভিন্ন শহর ও গ্রামকে বেছে নেওয়া হয় এই সব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র হিসাবে। কিন্তু কয়েক জন বিপ্লবীর দৃঢ়তার অভাবে ফাঁস হয়ে যায় আন্দোলনকারীদের গোপন কার্যপ্রণালী। ফলে পুলিশ জেলার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালিয়ে ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করে। বিপ্লবীদের এই কাজ ব্রিটিশরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত হয়। ১৯৩৪ সালের ১৪ জুলাই ২১ জন বিপ্লবীর নামে অভিযোগ দায়ের হয়। ২৬ জুলাই সিউড়ি আদালতে মামলা শুরু হয়। এই মামলাটিই 'বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। টানা দু'মাস এই মামলা চলার পর ১৯৩৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর রায় বের হয়। মামলার রায়ে ১৭ জন বিপ্লবীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দশ জনকে 'বিপজ্জনক বিপ্লবী' হিসেবে চিহ্নিত করে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয়।

১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনেও এই জেলার বিশেষ ভূমিকা ছিল। ৯ অগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলেও বীরভূমে আন্দোলনের ঢেউ এসে পড়েছিল ১৩ আগস্ট। আন্দোলনের সমর্থনে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পথে নেমে পড়েছিল। জায়গায় জায়গায় শুরু হয় পিকেটিং। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত, নৃসিংহ সেনগুপ্ত, দ্বারকেশ মিত্র, লালবিহারী সিংহ প্রমুখ। ওই বছরই ১৫ অগস্ট সিউড়ি শহরে জেলার শতাধিক বিপ্লবী বীরভূম জেলাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এর পরেই শুরু হয় পুলিশি তৎপরতা। গ্রেফতার করা হয় বহু নেতাকে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে বীরভূমের দুবরাজপুরেরও এক সমৃদ্ধ ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। '৪২-এর ১ সেপ্টেম্বর মিছিল করে আন্দোলনকারীরা আক্রমণ করেছিল দুবরাজপুর আদালত। তৎকালীন ব্রিটিশ পতাকা নামিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতের জাতীয় পতাকা।

বীরভূমের এক কৃতী সন্তান ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি বোলপুর থানার রায়পুর গ্রামে। ছোটোবেলাতেই হারিয়েছিলেন বাবাকে। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। লেখাপড়ায় ছিল প্রচণ্ড ঝোঁক। রায়পুরের সহৃদয় ব্যক্তি ও কলকাতার উকিল প্রেমানন্দ সিংহের সাহায্যে ভর্তি হন কলকাতার 'সাউথ সুবারবার্ন' স্কুলে। দারিদ্র্যের কারণে সপ্তম শ্রেণীর পর আর লেখাপড়া চালাতে পারেননি। সেই সময় অনুশীলন সমিতির উদ্যোগে চলছিল সশস্ত্র সংগ্রাম। ব্যোমকেশও সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋষি অরবিন্দ, বিপিন চন্দ্র পাল, মুকুন্দলাল প্রমুখ নেতার সঙ্গে শামিল হন আন্দোলনে। ১৯২২ সালে 'অসহযোগ' আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালে 'আইন অমান্য' আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুনরায় কারাবাস। বীরভূমের প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে যোগদান করেন। ১৯৩৬-৩৭ সালে লবণ আন্দোলনে যোগদান করে ৮-৯ মাস কারাবরণ করেন।

জন্মসূত্রে নদীয়ার মানুষ হলেও মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কেটেছিল বীরভূমে। বক্রেশ্বরের কাছে তাঁতিপাড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে মিহিরবাবু তার সমাজসেবা এবং ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যান। সিউড়ি জেলখানার ভিতরে দুর্গাপূজা শুরু করেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইংরাজি ভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় পড়তে গিয়ে অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন। সেখান থেকে ফিরে রামপুরহাটে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। পূর্বতন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পিতা কামদাকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। যুগলপদ দাস, কালীকৃষ্ণ মিত্র, কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, বিজয় কুমার ঘোষ, অমিয়ানন্দ দাশ, জ্যোতির্ময় রায়, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মায়া ঘোষ, নীহারিকা মজুমদার, লালবিহারী সিংহ, কিরিটিভূষণ দাস, বিমল বিষ্ণু প্রমুখ বীরভূমে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দীর্ঘ তালিকায় কয়েকটি নাম। শান্তিনিকেতনের রানী চন্দ্রকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত থাকার জন্য কারাগারে যেতে হয়েছিলো। জেলের অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন—'জেনানা ফাটক' বইয়ে। শান্তিনিকেতনের কাছে আমার কুটির মূলত রাজনৈতিক বন্দীদের আশ্রয়স্থল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুযেন মুখোপাধ্যায় একজন তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রামীণ পুনর্গঠন পরিকল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে পান্নালাল দাশগুপ্ত এখানে আসেন।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। রাজনৈতিক সক্রিয়তার কারণে তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ১৯৩০ এর ডিসেম্বর মাসে লাভপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন—'চৈতালি ঘূর্ণি'-র লেখক তারাশঙ্কর। ব্রিটিশ পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে প্রায় চার মাস সিউড়ি জেলে রাখে। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি বোলপুরে একটি ছাপাখানা করেন। কিন্তু সেই ছাপাখানা থেকে একটি ব্রিটিশ বিরোধী কবিতা ছাপার জন্য বীরভূম প্রশাসন দু হাজার টাকা জরিমানা করে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের পরামর্শে তিনি এই জরিমানা দেননি, সেই ছাপাখানা তুলে দিতে হয়।

আমাদের দেশের ইতিহাস পক্ষপাতহীনভাবে লিখিত হয়নি। স্বাধীনতা যোদ্ধাদের স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রেও এই মনোভাব কাজ করেছিল—বলাই বাহুল্য। তাই আগামীদিনে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান ও গবেষণা হলে এ জেলার এমন অনেকের কথা হয়তো জানা যাবে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য কোনোকিছুর আশা না করেই জীবনপণ করেছিলেন। এমন অনেকের কথা লোকমুখে শোনা যায় কিন্তু তথ্যের অভাবে তাদের অবদান তুলে ধরা যায় না। □

bharat

Litho

puts life in printing

98/4, S. N. Banerjee Road
Kolkata - 700 014
(India)
Phone : +91 33 22657862, 22493855
Fax : + 91 22651063
bharatlitho@gmail.com
surendradhote@gmail.com,
www.bharatlitho.com

With Best Compliments from-

Sindhuja Indocorp Pvt. Ltd.

5, Clive Row, 2nd Floor
Room No. 56
Kolkata - 700 001

With Best Compliments from-

A WELL WISHER

With Best Wishes-

UMAYA

Dry-Fruits & Spices
Umaya.contact@gmail.com
M.: 9831126557

With Best
Compliments from

A
Well
Wisher

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

Dil main
INDIA
Let's
illuminate
the nation
with
Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657

Panchayati Raj

জনগণের সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদ

প্রথম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের এক নজরে উন্নয়নের প্রচেষ্টা :-

১. গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের প্রয়াস।
২. গ্রামীণ শিক্ষাঙ্গনে পানীয়জলের উপর কর্মসূচী গ্রহণ।
৩. গ্রামীণ রাস্তা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন ও পরামর্শ দান।